একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

BIOTECHNOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ :
টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাসমিড, ইনস্যুলিন, জিনোম সিকোয়েন্সিং

নতুন শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণিতে জীবপ্রযুক্তি, টিস্যুকালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাস্তবক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমরা সংক্ষিপ্তভাবে জেনেছো। এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ।	পাঠ ১	জীবপ্রযুক্তি
❖ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপসমূহ।	পাঠ ২ ও ৩	টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার
❖ জিন ক্লোনিং-এর ব্যাখ্যা।	পাঠ ৪	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
❖ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি।	পাঠ ৫	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
❖ জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ।	পাঠ ৬	জিন ক্লোনিং
❖ জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা।	পাঠ ৭	জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার
❖ জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ।	পাঠ ৮	জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন
	পাঠ ৯	জিনোম সিকোয়েন্সিং ও এর প্রয়োগ
	পাঠ ১০	জীব নিরাপত্তার বিধানসমূহ

বায়োটেকনোলজি তথা জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। বায়োটেকনোলজি (জীবপ্রযুক্তি) শব্দটি আজ থেকে বহু পূর্বে ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন **হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি** (Karl Ereky)। Biology এবং Technology শব্দ দু'টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি।

বর্তমান বিশ্বউন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তিই জীবপ্রযুক্তি নয়। মাটি দিয়ে ইট তৈরিও একটি প্রযুক্তি, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস ওঠানোও প্রযুক্তিনির্ভর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে মুহূর্তেই যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সবই প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

উত্তম ব্যাকটেরিয়া প্রকরণ নির্বাচন করে উত্তম গুণমানের **দই তৈরি করা একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও একধরনের জীবপ্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীবপ্রযুক্তি।** ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে পচনশীল জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস তৈরি এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোটে একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো আধুনিক জীবপ্রযুক্তি। ১৯৭০ দশকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি নতুনমাত্রা লাভ করেছে।

জীবপ্রযুক্তির পরিধি (Scope of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির পরিধি ক্রমেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে, এটি ক্রম সম্প্রসারণশীল। মনে হচ্ছে আগামী দিনের জীববিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও বিশ্বসভ্যতা জীবপ্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাবে। আগামী দিন হবে জীবপ্রযুক্তির যুগ। ইদানিং জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

(i) ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) : এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির জলীয় ও সামুদ্রিক প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(ii) গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnolog) : এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(iii) রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি (Red & White Biotechnology) : এর দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রের বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

CamScanner

জীবপ্রযুক্তি কী?

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি। জীবপ্রযুক্তির আরো কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- মানবকল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের কলা-কৌশলকে জীবপ্রযুক্তি বলে।
- জীবপ্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কৌশলগত মূলনীতির মাধ্যমে জৈব উপকরণের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সেবামূলক কার্য সম্পাদন।
- মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে জৈবনিক প্রতিনিধিদের, যেমন–অণুজীব বা কোষীয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে জীবপ্রযুক্তি বলে।

জীবপ্রযুক্তির অবদান/গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির বহু পদ্ধতি ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। নিচে কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১। জিন প্রযুক্তিতে : (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষের) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগ নিরাময়। (iii) বিভিন্ন জীবাণু প্রয়োগে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার। (iv) বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ।

২। এনজাইম প্রযুক্তিতে : (i) উন্নতমানের এনজাইম উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ওষুধ, সঞ্চয়ী প্রোটিন প্রভৃতি জৈবযৌগের উৎপাদন।

৩। কৃষিক্ষেত্রে : (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাই প্রতিরোধী উদ্ভিদ জাত উৎপাদন। (iv) বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী সুস্থ ও সবল গবাদিপশু উদ্ভাবন। (v) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

৪। চিকিৎসাশাস্ত্রে : (i) বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন। (ii) ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। (iii) মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (iv) মস্তিষ্কে, হৃদপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে বায়োফার্মের মাধ্যমে হরমোন, অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরিকরণ।

৫। শিল্পক্ষেত্রে : (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন।

৬। পরিবেশ রক্ষায় : (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant tissue culture)

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন-শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা বা পাপড়ি ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন করা কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত (sterile) অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ (এবং পূর্ণাঙ্গ চারাউদ্ভিদ সৃষ্টি) করাকে টিস্যু কালচার বলে। অর্থাৎ গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার। বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের ধারণা অনেকে পোষণ করতেন। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী Morgan (1901) সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেন যে, প্রতিটি সজীব উদ্ভিদ কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এ ক্ষমতাকে তিনি টটিপোটেন্সি (Totipotency) বলে অভিহিত করেন। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে মাইক্রোপ্রোপাগেইশন বলা হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন প্রজন্ম বা ক্লোন তৈরি করা হয় বলে

CamScanner

একে ক্লোনিং প্রযুক্তিও বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশকে এক্সপ্লান্ট বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে অণুচারা (Plantlet) বলা হয়। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt (1902-)-কে টিস্যু কালচারের জনক বলা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিকে In-vitro কালচারও বলা হয়। In-vitro মানে কোষের বাইরে, In-vibo মানে কোষের ভেতরে। কারণ এ প্রক্রিয়াটি কাচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৩০ এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী Gautheret (১৯৩৯), আমেরিকান বিজ্ঞানী White (১৯৩৯) এবং অপর একজন ফরাসি বিজ্ঞানী Nobercourt (১৯৩৯) পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন।

টিস্যু কালচার, জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন শাখা হলেও ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।

টিস্যু কালচার গবেষণাগার : টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গবেষণাগার (Laboratory) আবশ্যক, যেখানে ৩টি কক্ষ থাকবে।

(i) একটিতে সাধারণ কার্যক্রম (যেমন- মিডিয়াম প্রস্তুতকরণ, সংগৃহীত উদ্ভিদাংশ পরিষ্কারকরণ, অটোক্লেভ করা প্রভৃতি) সম্পন্ন করা হয়।

(ii) একটিতে ল্যামিনার এয়ার ফ্লো সমন্বিত ইনোকুলেশন চেম্বার, যেখানে কালচার উপযোগী অংশগুলো জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার ভেসেলে প্রবিষ্ট করানো হয়।

(iii) একটিতে কালচার চেম্বার, যেখানে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোক তীব্রতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং এ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কালচার ভেসেল সংরক্ষিত থাকে, যা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কালচারকৃত উদ্ভিদাংশের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ওয়াশিং বাকেট, নিক্তি (balance), P^H মিটার, অটোক্লেভ, অণুবীক্ষণযন্ত্র, মাইক্রোটোম, রেফ্রিজারেটর, ল্যামিনার এয়ার ফ্লো কেবিনেট, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, শ্যাকার, ব্লেন্ডার প্রভৃতি।

কাচের উপকরণ : টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, আয়তনিক ফ্লাস্ক, বিকার, পেট্রিডিস, মাপচোঙ, পিপেট, খাঁজযুক্ত কাচদণ্ড, বোতল ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য : কালচার মিডিয়াম তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, বৃদ্ধি হরমোন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, চারকোল ঈস্ট, অ্যালকোহল, স্পিরিট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি।

অন্যান্য উপকরণ : কাঁচি, চিমটা, সার্জিক্যাল ব্লেড, সিকেটিয়ার, স্পেচুলা, ফিল্টার পেপার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, প্লাস্টিকের পাত্র ইত্যাদি।

জীবাণুমুক্ত পরিবেশ : টিস্যু কালচার এর জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ দরকার। ব্যবহার্য সব উপকরণ জীবাণুমুক্ত করা প্রাথমিক কাজ। কালচার মিডিয়াম কোনোভাবে সংক্রামিত হলে মিডিয়াম (মাধ্যম) আর ব্যবহার করা যায় না। কালচার মিডিয়ামের পাত্র ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র গরমবায়ু ওভেনে ১৬০° সেলসিয়াস থেকে ১৮০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১-২ ঘণ্টা রেখে নির্বীজ (Sterilize) করা হয়। ফরসেপস, নিডল, স্কালপেল ইত্যাদি উপকরণ বার্নারে গরম করে ৯৫% অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে; যেমন— কক্ষমুকুল কালচার (axillary bud culture), মেরিস্টেম কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ক্যালাস কালচার-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন (somatic embryogenesis), পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ইত্যাদি।

CamScanner

টিস্যু কালচার পদ্ধতির (প্রযুক্তির) ধাপসমূহ : নিম্নলিখিত ধাপে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বর্ণনা করা যায় :

১। মাতৃউদ্ভিদ বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন : এক্সপ্লান্ট হলো ঐ উদ্ভিদাংশ, টিস্যু কালচারে ব্যবহারের জন্য যাকে কোনো উদ্ভিদ থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। কাজেই এক্সপ্লান্ট নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত কাণ্ডের শীর্ষমুকুল, পার্শ্বমুকুল এক্সপ্লান্ট হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। পর্ব বা পাতার শীর্ষও ব্যবহৃত হয়। যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্ট নেয়া হয় বা হবে সেটি হলো **মাতৃউদ্ভিদ**। মাতৃউদ্ভিদটি অবশ্যই নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। টিস্যু কালচারের জন্য সুস্থ, নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে।

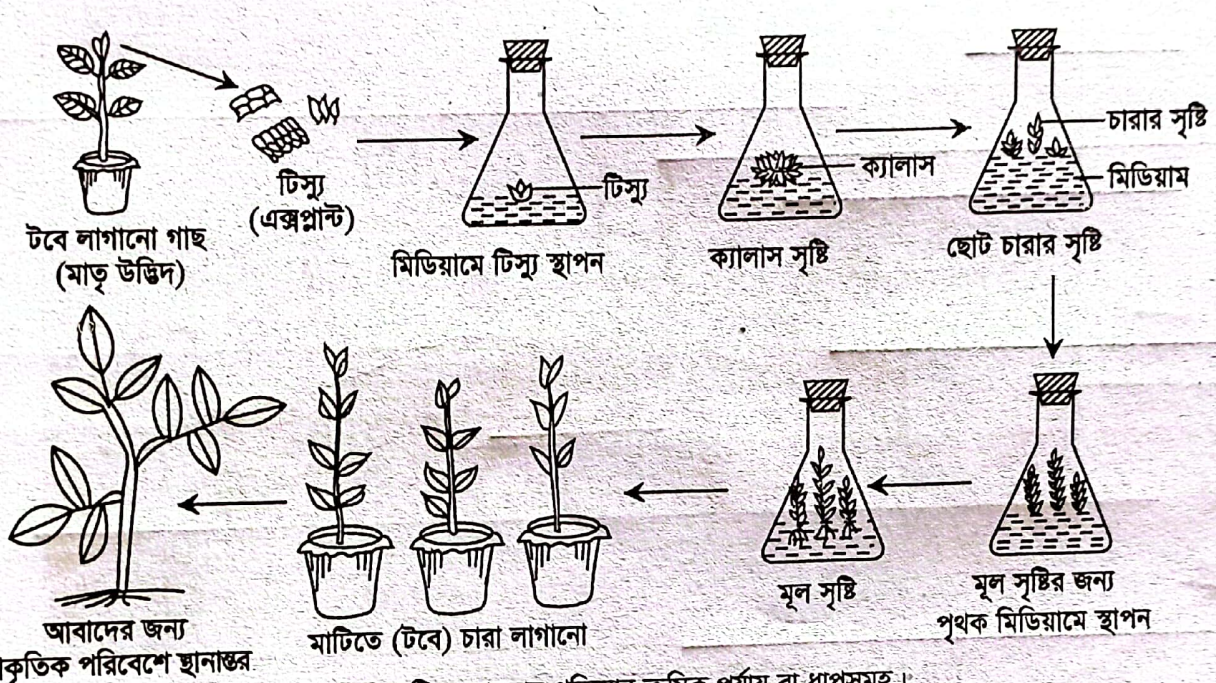

চিত্র ১১.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায় বা ধাপসমূহ।

২। কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচার কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি কালচার মিডিয়াম তৈরি করা আবশ্যক। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে এ মিডিয়াম প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান (macro and micro elements), ভিটামিন, সুক্রোজ (২–৪%), ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন– অ্যাগার, সঠিক মাত্রায় মেশাতে হয়। মৌলিক উপাদানসমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে **ব্যাসাল মিডিয়াম** বলে। মিডিয়ামের pH ৫.৫–৫.৮ এর মধ্যে রাখা হয়।

৩। জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ : কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান, ফলে এতে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট সবই জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্টটিউবে ঢেলে নির্বীজকৃত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। এরপর পাত্রটিকে নির্বীজকরণ যন্ত্র (autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে অটোক্লেভ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১° সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিই হলো **ইন-ভিট্রো কালচার**।

৪। মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন : এক্সপ্লান্টকে নির্বীজ করে (সাথে হাত, চিমটা ইত্যাদিকে অ্যালকোহল দিয়ে নির্বীজ করতে হয়) সম্পূর্ণ নির্বীজ অবস্থায় কাচপাত্রে রাখা মিডিয়ামে স্থাপন করা হয়।

৫। ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি : মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর পাত্রটিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো (৩,০০০–৫,০০০ লাক্স বা ১০০০–৩০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭°–২০° সে.) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭০–৭৫%)

নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়। কয়েকদিন পর টিস্যুটি বার বার বিভাজিত হয়ে একটি কোষীয় মণ্ডে পরিণত হয়। মণ্ড হলো অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ। এক্সপ্লান্ট মিডিয়ামে স্থাপন করার পর আলো ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখলে যে অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তা হলো **ক্যালাস**। ক্যালাস থেকে এক সময় অসংখ্য মুকুল সৃষ্টি হয়।

চিত্র ·১১.১.১ : একটি টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার (আংশিক)

৬। মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন : মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছে পরিণত হয়।

৭। চারা টবে স্থানান্তর : উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়, তবে রোপিত চারাগাছগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগাছগুলো সজীব ও সবল হয়ে ওঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে টিস্যু কালচার বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের ওপর। ওপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

কাজ : টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ ক্রমধারায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করো।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ভূমিকা/প্রয়োগ (Application of tissue culture technology)

টিস্যু কালচার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রজননবিদরা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো।

CamScanner

১। **হুবহু মাতৃ-গুণাগুণসম্পন্ন চারা উৎপাদন বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন :** যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন- থুজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ (planlet) উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

ফুল, ফল বা শস্য উৎপাদনকারী কোনো ভালো জাতের উদ্ভিদ থেকে যদি অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদিত চারাগাছসমূহ হুবহু এদের মাতৃ-উদ্ভিদের মতো হয়ে থাকে। কাজেই একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়া। অতি ক্ষুদ্র টিস্যু থেকে বহু চারা উৎপাদনের এ পদ্ধতি মাইক্রোপ্রোপাগেশন নামেও পরিচিত।

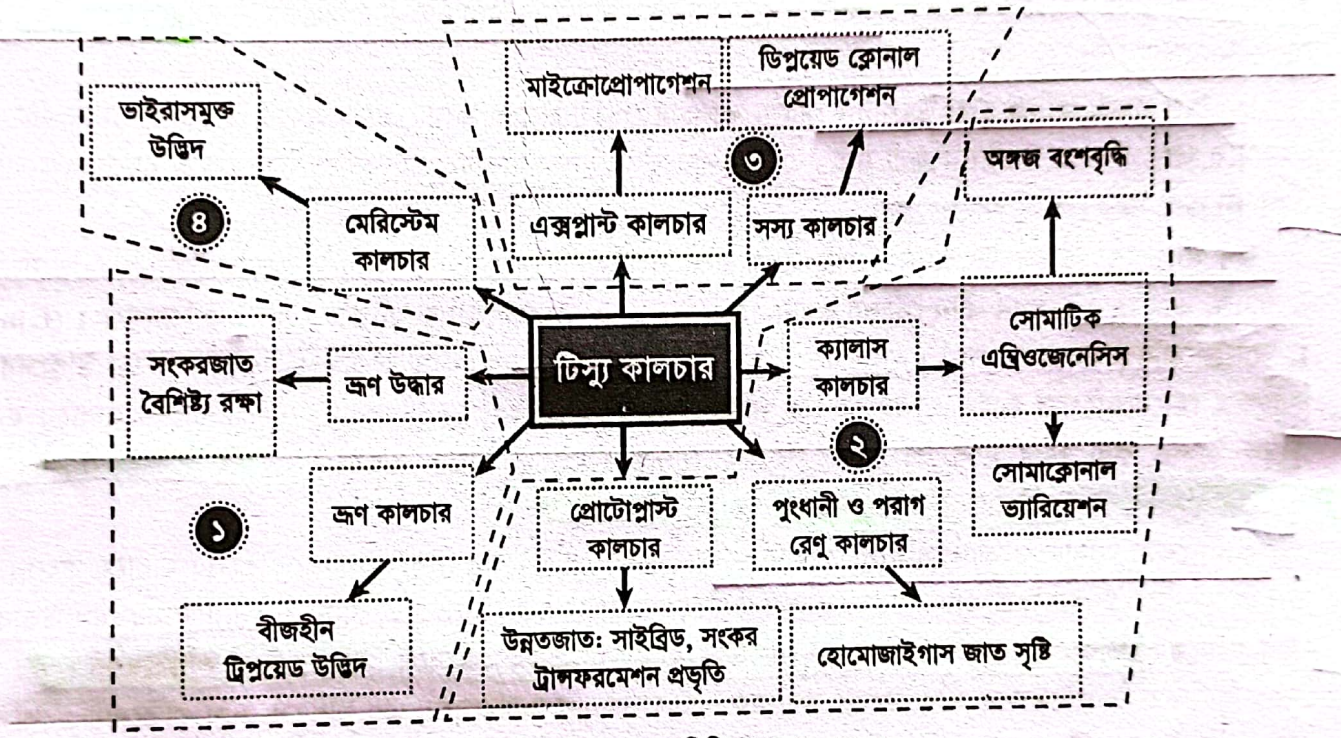

চিত্র ১১.২ : টিস্যু কালচারের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ

২। **রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। আলু, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। **চারা উৎপাদন :** যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারা গাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

৪। **বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব।

৫। **ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণ কালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

৬। **সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন (ফিউশন) :** এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি ও তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়নের ক্ষেত্রে

CamScanner

পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ঘটে। পুংগ্যামিটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রীগ্যামিটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে **সোমাটিক হাইব্রিড** তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে (নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না)। দুটো উদ্ভিদের শুধু সাইটোপ্লাজমের মিলনে সৃষ্ট উদ্ভিদকে হাইব্রিড না বলে **সাইব্রিড** (cybrid) বলা হয়। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমেই সাইটোপ্লাজমের বিশেষ গুণ স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আলু ও টম্যাটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে **পোম্যাটো**।

৭। **মেরিস্টেম কালচার :** মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে **মেরিস্টেম** বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

৮। **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনো একটি উদ্ভিদের সামান্য টিস্যু থেকে অল্পসময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট্ট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৯। **হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন :** পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন–চীন দেশের **গুয়ান-18 (Guan-18, অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড ধান)** ও **জিনঘুয়া-1 (Ginghua-1, অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড গম)**। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ঈপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

১০। **কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ :** কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ কৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ভ্রূণ থেকে বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উন্নতজাত যেমন– AdhI নামক গম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। যেকোনো আবাদি উদ্ভিদকোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলে সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন। এর মাধ্যমে উন্নত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হয়। সোমাক্লোনাল-ভ্যারিয়েশন এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আবাদি গ্যামিট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে বলে গ্যামিটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।

১১। **দ্রুত ক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তার :** একই দাতা উদ্ভিদের কোষ নিয়ে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অসংখ্য উদ্ভিদ ক্লোন তৈরি করা যায়। এভাবে সুন্দর ফুলদায়ী অনেক অর্কিড প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২। **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি :** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে সংযোজন করা সম্ভব হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ ধরনের কোষ বা ভ্রূণ হতে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। আগাছারোধী, পতঙ্গরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ যেমন– আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, **স্বর্ণধান** (golden rice) ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

১৩। **ভ্রূণ উদ্ধার :** দুটি ভিন্ন প্রজাতির সংকরায়নে সৃষ্ট F_1 অপত্য প্রায়শই বন্ধ্যা হয়। এমন বন্ধ্যা উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হলে তা মারা যায় বা তা থেকে কোনো বীজ উৎপন্ন হয় না। এমন সংকর উদ্ভিদ থেকে ভ্রূণ উদ্ধার করে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করে (Culture medium) স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

১৪। **দেহজ ভ্রূণ সৃষ্টি :** এ পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক একেকটি দেহকোষ থেকে পুষ্টি মাধ্যমে একেকটি ভ্রূণ সৃষ্টি করা যায়। গাজর, আলফা-আলফা প্রভৃতি গাছের এ প্রক্রিয়ায় অল্প জায়গায় অসংখ্য ভ্রূণ তৈরি করা যায়।

CamScanner

১৫। **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** মালয়েশিয়ায় Oil palm এর টিস্যু কালচার করা হচ্ছে। এ দেশটি পাম তেল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিভিন্ন দেশে (যেমন- থাইল্যান্ড) অর্কিডের টিস্যু কালচার করা হয় এবং অর্কিড ফুল রপ্তানি করে এসব দেশ কোটি কোটি টাকা আয় করে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচার কাজের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই টিস্যু কালচার কাজ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

(১) বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

(২) কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

(৩) চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৪) কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৫) বিভিন্ন প্রকার ডালজাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।

(৬) পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।

(৭) টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারেও টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ করা হচ্ছে। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানাধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন। বর্তমানে শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরি ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী করে জার্ম-প্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশি ও বিদেশি নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন, মুগ কলাই ও মাষ কলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বর্তমানে বহু প্রাইভেট সংস্থা (NGO) তথা ব্র্যাক কর্তৃক *Stevia* (স্টেভিয়ার পাতা চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়), প্রশিকার বিদেশি অর্কিড ও গোলআলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো :

সুবিধাসমূহ

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।

২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। কলমে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

CamScanner

৬। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন।

৭। উদ্ভিদের যেকোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।

৮। অতি সস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন।

৯। বিদেশি জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশি আবহাওয়া উপযোগী জাত সৃষ্টি করা।

১০। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

১১। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুনঃউৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন— ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যক সম্ভাবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়।

৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।

৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

Genetic Engineering and Recombinant DNA Technology

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জীববিজ্ঞানের একটি নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ্য কোনো কাঙ্ক্ষিত 'জিন' স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীবপ্রকরণ সৃষ্টি করা। কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্যকোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GEO (Genetically Engineered Organism) বা ট্রান্সজেনিকস্ (TO = Transgenic Organism)। মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করিয়ে এখন ঐসমস্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সায়েন্স ফিকশন লেখক Jack Williamson তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island-এ সর্বপ্রথম Genetic engineering শব্দটি ব্যবহার করেন।

একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য জীবের কোষের DNA এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে যে নতুন (মিশ্রিত) DNA উৎপন্ন হয় তাকে **Recombinant DNA** বলে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য যে পদ্ধতি বা টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (recombinant DNA technology)। এ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে ছেদন করে ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। একে জিন ক্লোনিং বলা হয়। এভাবে ক্লোন করা জিনটি চাহিদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়, যেমন— (i) প্রয়োজনীয়

CamScanner

পরিমাণ প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং (ii) অন্য কাঙ্ক্ষিত জীবে বিশেষ করে উদ্ভিদে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন করা। পরবর্তীতে এ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এর শুরু, কিন্তু ইতোমধ্যেই মানব সমাজ এর থেকে লাভবান হতে শুরু করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উল্লিখিত অণুজীবসমূহের মধ্যে *E. coli*, *Agrobacterium tumefaciens* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ছোটো বৃত্তাকার DNA অণু থাকে। অতিরিক্ত এই বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় **প্লাসমিড** (plasmid)। প্লাসমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সন্নিবেশন এবং সন্নিবেশিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাসমিড (Plasmid) : ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে তাকে প্লাসমিড বলে। Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান। প্লাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে অনুলিপন (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোসোমের বাইরে একটি অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA (ক্রোমোসোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাসমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষ প্রতি ১–১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাসমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। প্লাসমিড বৃত্তাকার (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।

২। এর আণবিক ভর প্রায় $10^6 - 200 \times 10^6$ dalton.

৩। প্লাসমিড অল্পসংখ্যক জিন ধারণ করে থাকে।

৪। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাসমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।

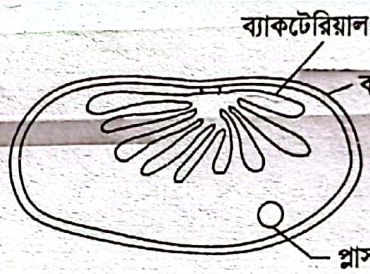

চিত্র ১১.৩ : *Agrobacterium tumefaciens* এর প্লাসমিড DNA।

৫। এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে।

৬। কোনো কোনো প্লাসমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন— colicin, vibriocin ইত্যাদি।

৭। প্লাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাব অনুলিপন (replicate) করতে পারে।

প্লাসমিডের প্রকারভেদ : প্লাসমিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা—

(i) F এবং F´ প্লাসমিড : এসব প্লাসমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। F(fertility) ও F´-প্লাসমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে Pili তৈরি করে, যা তাদের যৌনজননে সাহায্য করে।

(ii) R-প্লাসমিড : এসব প্লাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে। R_6-প্লাসমিড ৬টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

(iii) কোল প্লাসমিড : যেসব প্লাসমিডে **কোলিসিন** (Colicin) উৎপাদনকারী জিন থাকে তাদেরকে **কোল প্লাসমিড** বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাসমিডের সমতুল্য আরেক ধরনের প্লাসমিড আছে যাতে **ভিব্রিওসিন** (Vibriocin) উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল *Vibrio cholerae* কোষকে ধ্বংস করে দেয়।

প্লাসমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাসমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কজে প্লাসমিড অত্যন্ত উপযোগী **বাহক** (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাসমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন, মানুষের ইনসুলিন জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

CamScanner

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাসমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) টার্গেট এবং বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন। উভয় ক্ষেত্রে একই এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA-এর অনুলিপনের জন্য একটি পোষক (host) নির্বাচন (যেমন- *E. coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্ক্ষিত DNA অণু নির্বাচন। নির্বাচনের পর কাঙ্ক্ষিত জীবের কোষ থেকে DNA-কে পৃথক করতে হবে। প্রথমে কোষকে লাইসিস (lysis) করা হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড প্রভৃতি অণু হতে DNA অণুকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এ DNA-এর সাথে কিছু পরিমাণ RNA ও প্রোটিন মিশ্রিত থাকে। পরবর্তীতে সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুকরোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে উক্ত মিশ্রণকে নির্দিষ্ট ব্যান্ড আকারে পৃথক করা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত DNA ব্যান্ডকে পৃথকভাবে আহরণ করে নেয়া হয়। বর্তমানে সিলিকা নির্ভর কিট ব্যবহার করে এ কাজটি অনেক সহজে করা যায়।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme) : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-এর একটি অংশ কেটে নেয়া যায় ঐ এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। এদেরকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (endonucleases)ও বলা হয়। এরা DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স, যাকে রেস্ট্রিকশন সাইট (restriction site বা recognition site) বলা হয়, তা কেটে দিতে সক্ষম। এ ধরনের এনজাইম প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান থাকে। এদের কাজ হলো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাল DNA কেটে দেয়া। স্বাভাবিকভাবে এরা ভাইরাল DNA কেটে থাকে, তবে যেকোনো উৎস থেকে পাওয়া যেকোনো DNA সূত্রের নিউক্লিওটাইডের ঐ একই সিকোয়েন্স (রেস্ট্রিকশন সাইট) সমান দক্ষতার সাথে কাটতে সক্ষম।

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ কমপক্ষে একটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন করে থাকে। শত শত প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষে শত শত ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন হয়। এরা DNA সূত্র কাটার জন্য নিজস্ব সিকোয়েন্স শনাক্ত করতে পারে এবং ঐ রেস্ট্রিকশন সাইট কেটে দিতে পারে।

(খ) ভেক্টর (বাহক) DNA নির্বাচন : কাঙ্ক্ষিত DNA-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহন করার জন্য একটি বাহক (vector) নির্বাচন করতে হয়। ব্যাকটেরিয়াতে অবস্থিত প্লাসমিড-DNA-কে কাঙ্ক্ষিত DNA বহন করার জন্য বাহক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ বাহক প্লাসমিড DNA-কে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন (modify) করে নেয়া হয়। যেমন— (i) কাঙ্ক্ষিত DNA থেকে রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করতে চাইলে বাহকের ভেতর কাঙ্ক্ষিত DNA-র ৫′-প্রান্তে প্রোমোটার ও ৩′-প্রান্তে টারমিনেটর সিকোয়েন্স যোগ করতে হয়। (ii) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে উদ্ভিদকোষে প্রতিস্থাপন করতে হলে কাঙ্ক্ষিত DNA টি *Agrobacterium tumefaciens*-এর Ti-প্লাসমিডের T-DNA-র ভেতরে প্রোমোটার ও টারমিনেটরসহ স্থাপন করতে হয়। (iii) সাধারণভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলে সাধারণ প্লাসমিডে স্থাপন করতে হয়।

(গ) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন : সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত DNA-এর নির্দিষ্ট অংশকে খণ্ড করা হয়। একই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক DNA তেও (যেমন-*A. tumefaciens*-এর T প্লাসমিড DNA) ছেদন করে নেয়া হয় (চিত্র : ১১.৪, ১১.৫)।

CamScanner

[কাঙ্ক্ষিত DNA-ই এ সংক্রান্ত DNA খণ্ড বহন করে। বিভিন্ন জীবের জন্যই লাইব্রেরি আছে, যেমন— *E. coli* লাইব্রেরি, মানব জিনোম লাইব্রেরি ইত্যাদি। এখন আবার কমপ্লিমেন্টারি DNA (cDNA) লাইব্রেরিও আছে। cDNA হলো mRNA-এর কমপ্লিমেন্টারি কপি। যেসব জিন বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম সে সব জিন cDNA লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। একজন গবেষক cDNA লাইব্রেরি থেকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড পেতে পারেন। **DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব** (কাঙ্ক্ষিক DNA সিকোয়েন্সের সম্পূরক একক খণ্ডক রেডিওঅ্যাকটিভ DNA খণ্ড) ব্যবহার করে (কারণ এ প্রোব কাঙ্ক্ষিত DNA-এর সাথে হাইব্রিডাইজ করবে) লাইব্রেরি থেকে ক্লোন শনাক্ত করে PCR-এর মাধ্যমে সে কাঙ্ক্ষিত সিকোয়েন্স খণ্ড বের করে আনা যাবে। বর্তমানে জিন মেশিনের (automated chemical Synthesis apparatus) সাহায্যে সহজেই DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব ও PCR-এ ব্যবহৃত প্রাইমার তৈরি করা যায়।]

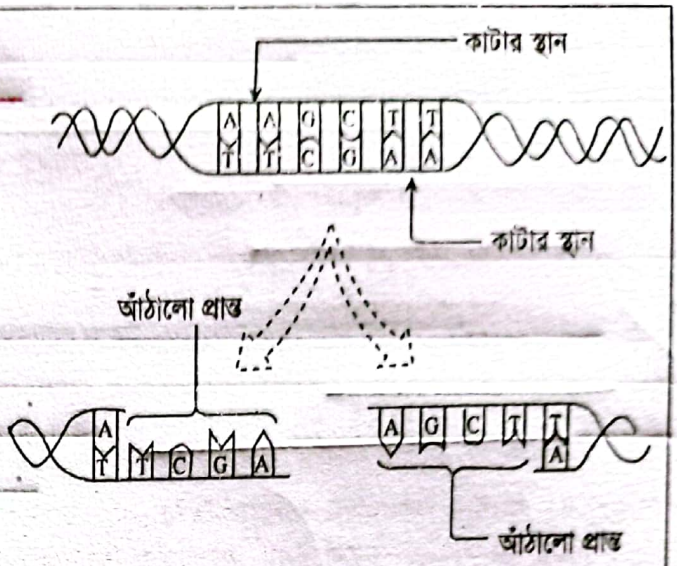

চিত্র ১১.৪ : রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে DNA কর্তন।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে; যেমন— Eco RI (*Escherichia coli* Ry 13), Hind III (*Haemophilus influenzae* Rd), Bam HI (*Bacillus amyloliquefaciens* H) প্রভৃতি। রেস্ট্রিকশন এনজাইমসমূহ DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান পদ্ধতির (specific base sequences) অংশকে কেটে দেয় এবং একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা প্লাসমিডের ঐ একই বেস সিকোয়েন্সবিশিষ্ট অংশকে কাটা যায়। সাধারণত এরা ৪–৬ জোড়া বেস অংশ কেটে থাকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে DNA অণু কর্তনের সূক্ষ্ম ছুরিকা (molecular scissors-আণবিক কাঁচি বা বায়োলজিক্যাল নাইফ) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান নিচে দেখানো হলো :

এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান	এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান
Bam HI	G | GATCC CCTAG | G	Hpa II	C | CGG GGC | C
Hind III	A | AGCTT TTCGA | A	Mbo I	| GATC CTAG
Eco RI	G | AATTC CTTAA | G		

\| দিয়ে DNA অণুর কাটার স্থান দেখানো হয়েছে।

(ঘ) ছেদনকৃত কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে বাহক প্লাসমিড DNA-তে স্থাপন : প্লাসমিড DNA হতে বের করে নেয়া অংশের ফাঁকা স্থানে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। DNA-ligase এনজাইম ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ফলে প্লাসমিড DNA-টি কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড বহন করে। **কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড প্লাসমিড DNA-তে সংযুক্ত হবার ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হলো।**

(ঙ) পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড DNA পোষককোষে প্রবেশ করানো : রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পরে কোনো পোষক ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া অন্য প্লাসমিড গ্রহণ করে না। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে heat shock-এর মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্লাসমিড গ্রহণ করতে পারে। প্লাসমিড গ্রহণ করলে ঐ ব্যাকটেরিয়ামকে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়াম (transformed bacterium) বলে। পরবর্তীতে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডটিও সংখ্যাবৃদ্ধি করে বলে একে ক্লোনিংও বলা হয়। DNA অনুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো Electroporation।

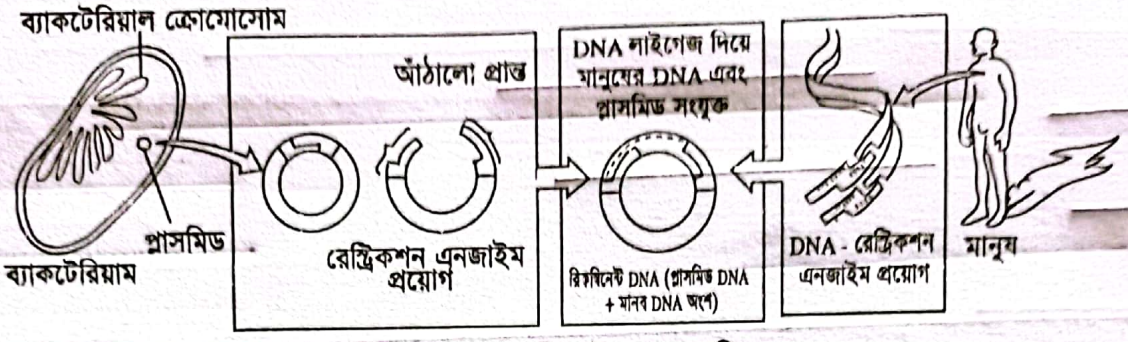

চিত্র ১১.৫ : রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি।

(চ) রিকম্বিনেন্ট DNA-এর মূল্যায়ন : সাধারণত রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার কাজটি সফলভাবে হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ঐ ব্যাকটেরিয়াম (পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত) অ্যাগার মিডিয়ামে জন্মিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে পোষক ব্যাকটেরিয়া recombinant plasmid বহন করছে কিনা তা শনাক্ত করার জন্য অ্যাগার মিডিয়ামে নির্দিষ্ট antibiotic ব্যবহার করতে হয় কারণ বাহক প্লাসমিডে ঐ antibiotic এর resistance gene রয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্ক্ষিত জিন বহন করছে কিনা তা শনাক্তকরণ : এটি করা হয় (i) PCR পদ্ধতিতে, (ii) Restriction digestion-এর মাধ্যমে এবং (iii) জেনেটিক প্রোব-এর মাধ্যমে। **জেনেটিক প্রোব** (genetic probe) device মেটাল ডিটেক্টর-এর তুলনীয় একটি উপায়। জেনেটিক প্রোব হলো রেডিও অ্যাকটিভলি চিহ্নিত **টার্গেট জিনের** (কাঙ্ক্ষিত জিনের) পরিপূরক এক স্ট্র্যান্ডবিশিষ্ট DNA বা mRNA।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করে থাকলে ঐ DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করতে হয়।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো : কাঙ্ক্ষিত জিনসমৃদ্ধ কোনো কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে হলে কাঙ্ক্ষিত জিনকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে *Agrobacterium tumefacians*-এর মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবে এবং পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় ঐ কোষ থেকে নতুন ও কাঙ্ক্ষিত জিনসহ নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। এরূপ উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** (transgenic plant) বলে। **এখানেই টিস্যু কালচারের সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক।**

Implanta পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। *Arabidopsis* উদ্ভিদের পুষ্পমঞ্জরীকে *Agrobacterium* সাসপেনসনে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রেখেও সহজে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় টিস্যু কালচারের দরকার পড়ে না।

সফল জেনেটিক মডিফিকেশনের জন্য রিকম্বিনেন্ট DNA কে অবশ্যই একটি কোষে (উদ্ভিদ) প্রবেশ করাতে হবে এবং অবশ্যই ঐ রিকম্বিনেন্ট DNA কে কোষস্থ নিউক্লিয়াসের কোনো ক্রোমোসোমে বা ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(ক) প্রত্যক্ষ ভৌতিক (Physical) প্রক্রিয়া

(i) **Electroporation :** তৈরি ইলেকট্রিক ক্ষেত্র কোষঝিল্লিতে সংকীর্ণ ছিদ্র তৈরি করে এবং রিকম্বিনেন্ট DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Micro injection :** একটি মাইক্রোপিপেট দিয়ে কোষকে ধরে রাখা হয় এবং অন্য একটি অতিসূক্ষ্ম সুঁই দিয়ে DNA কে কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(iii) **Biolistics (Gunshot) :** কোনো ধাতব পিণ্ডের (স্বর্ণের) উপরিতলে DNA বসিয়ে সেই পিণ্ডকে Gunshot করে উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(খ) প্রত্যক্ষ রাসায়নিক (Chemical) প্রক্রিয়া

(i) **Calcium Chloride :** কোষকে ঠাণ্ডা $CaCl_2$ দ্রবণে ইনকিউবেট করে পরে 'হিটশক' দিলে DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Liposomes :** কৃত্রিম ভেসিকলের (Vesicle) সাথে DNA সম্পৃক্ত হয়, পরে কোষঝিল্লির সাথে ভেসিকল সংযুক্ত হয়ে যায় এবং DNA কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

(গ) ভেক্টর ব্যবহারের পরোক্ষ প্রক্রিয়া

(i) ***Agrobacterium tumefaciens*** নামক ব্যাকটেরিয়াকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে এটা করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড কাঙ্ক্ষিত জিনসহ সহজেই উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করতে পারে।

(ii) **TMV:** TMV কাঙ্ক্ষিত জিনসহ এর RNA কে উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করাতে সক্ষম। তামাক গাছে সহজে প্রবেশ করে থাকে।

ব্যাকটেরিয়াতে বাইরের DNA প্রবেশ করানোকে বলা হয় *ট্রান্সফরমেশন* এবং প্লাসমিডকে প্রকৃত কোষে প্রবেশ করানোকে বলা হয় *ট্রান্সফেকশন*।

CamScanner

টিস্যু কালচার ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	টিস্যু কালচার	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
১. সংজ্ঞা	জীবদেহের বিচ্ছিন্ন করা কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কালচার (আবাদ) করে চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি বা টিস্যু বৃদ্ধির (প্রাণীর ক্ষেত্রে) প্রক্রিয়াই হলো টিস্যু কালচার।	কোনো জীবের DNA-তে ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA খণ্ড সংযুক্ত করে সংকর (হাইব্রিড) DNA তৈরির কৌশলই হলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি।
২. উৎপাদন	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা সম্ভব।	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব নয়।
৩. ব্যবহার	ভাইরাস ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।	কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।
৪. প্রক্রিয়া	অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়া।	অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল প্রক্রিয়া।
৫. প্লাসমিড ব্যবহার	এক্ষেত্রে প্লাসমিডের প্রয়োজন হয় না, কারণ জিন স্থানান্তরণ বিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই।	এক্ষেত্রে প্লাসমিডের প্রয়োজন হয়, কারণ জিন স্থানান্তর বা বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।
৬. জিন	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপ পরিবর্তন করা হয় না।	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপ পরিবর্তন করা হয়।
৭. অপত্য উদ্ভিদের ধরন	উৎপন্ন উদ্ভিদ মাতৃউদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়।	উৎপন্ন জীব প্যারেন্ট জীব থেকে ভিন্নগুণসম্পন্ন হয়।

জিন ক্লোনিং (Gene Cloning)

ক্লোন (clone) শব্দের অর্থ-হুবহু প্রতিরূপ। একই জিনোটাইপবিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। একটি জবা গাছ থেকে ১০টি ডাল কেটে চারা করলে এরা হবে হুবহু একই জিনোটাইপসম্পন্ন এবং এরা হলো ক্লোন। ক্লোন মাতৃউদ্ভিদের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। সাধারণত কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ থেকে এ ক্লোনিং করা হয়। মনে করি একটি চা গাছের চা উত্তম মানের হয়, কাজেই ঐ গাছটি হলো কাঙ্ক্ষিত গাছ। ঐ গাছ থেকে ক্লোন করে বাগান বৃদ্ধি করলে পুরো বাগান থেকেই উন্নতমানের চা পাওয়া যাবে। বর্তমানে চা বাগানে ক্লোনাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জিন ক্লোনিং হলো কোনো জীবের DNA পৃথক করে তা থেকে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত জিন চিহ্নিত করে ঐ জিনকে হুবহু কপি করা। সহজ কথায় **কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যাবৃদ্ধি করাই হলো জিন ক্লোনিং।**

একটি ক্রোমোসোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলোই কাঙ্ক্ষিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত বিজ্ঞানিগণ জীবের DNA-এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করেন।

গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্যই হোক রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা। **একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো জিন ক্লোনিং।**

জিন ক্লোনিং-এর জন্য জিন-এর উৎস : তিনটি উৎস থেকে তা পাওয়া যায়–

i. বিনা ক্রাইটেরিয়ায় (random) তৈরি ক্রোমোসোমের খণ্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভুক্ত করা। এগুলো জিন-লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ii. সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্লিমেন্টারি DNA।

iii. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA খণ্ড।

PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) : ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং-এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা PCR বলা হয়।

CamScanner

একটি টেস্টটিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায় PCR এর মাধ্যমে। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA-কে ৯০° সে. তাপমাত্রায় একক সূত্রক করা হয়। DNA রেপ্লিকেশনের জন্য ৫'-প্রান্তে একটি প্রাইমার যুক্ত করা হয়। একটি আদর্শ প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। DNA পলিমারেজ তখন সম্পূরক সূত্র তৈরি করে দেয়। কয়েক মিনিটেই কপি তৈরি হয় এবং অল্পসময়ে অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে যায়। এটি খুবই সহজ একটি উপায়। সাধারণত এ সূত্র তৈরির হার ১০০০ বেস প্রতি মিনিটে। তবে বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এ হার আরো বাড়ানো হয়েছে, ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

ক্লোনিং-এর প্রকারভেদ : বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং পদ্ধতি আছে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(i) DNA ক্লোনিং : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয়। এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত। কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড কেটে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে প্লাসমিড DNAটি একটি রিকম্বিনেন্ট DNA-তে পরিণত হয়। উপযুক্ত মাধ্যমে এ রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ব্যাকটেরিয়াম আবাদ করলে অল্প সময়ে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ামে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন থাকবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করা হয়।

(ii) রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং : জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়ার সৃষ্টি এ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। একটি ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে (একটি দাতাকোষ বা দাতা ভেড়া) তাকে আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরে একটি ভেড়ার ডিম্বাণু কোষ (গ্রহীতা কোষ) নিয়ে তা থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে দাতা কোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়। ডিম্বাণুটি দাতাকোষের নিউক্লিয়াস নিয়ে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছায়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। তৃতীয় ভেড়াটি নির্দিষ্ট সময় পর দাতা ভেড়ার চেহারাসম্পন্ন একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর নাম দেয়া হয়েছিল **ডলি** (১৯৯৬ সালে ডলির জন্ম হয়)। ডলির জন্মই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর উদাহরণ। একইভাবে মানব ক্লোন করাও সম্ভব হচ্ছে।

rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি ও PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি	PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন)
১। ক্লোনিং	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের ক্লোনিং এবং প্রকাশ ঘটানো হয়।	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের শুধুমাত্র ক্লোনিং ঘটানো হয়।
২। সংঘটিত পদ্ধতি	এটি *In-vivo* পদ্ধতি। (সজীব কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত)	এটি *In-vitro* পদ্ধতি। (সজীব কোষের বাইরে সংঘটিত)
৩। ভেক্টরের ভূমিকা	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক।	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক নয়।
৪। উৎসেচক বা এনজাইম	rDNA টেকনোলজির প্রধান উৎসেচক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং DNA লাইগেজ।	PCR এর প্রধান উৎসেচক তাপ সহিষ্ণু DNA পলিমারেজ।
৫। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে rDNA টেকনোলজির ভূমিকা সবচেয়ে অধিক।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে PCR এর ভূমিকা কম।

জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি বিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। এর দ্বারা জেনেটিক মডিফিকেশন ঘটানো হয়।

ক্রপ জেনেটিক মডিফিকেশনের উদ্দেশ্য

১। **উপকারী দ্রব্য উৎপাদন (Novel products) :** ফসল উদ্ভিদে এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে ঐ উদ্ভিদ উপকারী নতুন কোনো দ্রব্য (যা ঐ উদ্ভিদ আগে উৎপাদন করতে পারতো না) উৎপাদন করতে পারে। যেমন— তামাক গাছে হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন উৎপাদন।

CamScanner

২। **পরিবেশীয় প্রতিকূলতা উত্তরণ (Overcoming environmental resistance)** : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে লবণাক্ততা, ঠাণ্ডা (frost), খরা বা ফসলের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধকারী অন্য যেকোনো নিয়ামকের বিরুদ্ধে অধিক সহিষ্ণু হয়। যেমন– লবণাক্ততা সহিষ্ণু 'পীনাট' উদ্ভাবন।

৩। **ক্ষতিকর পোকা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Pest resistance)** : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে ফসলের জন্য ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে তেমন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন– Bt cotton.

৪। **আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Herbicide resistance)** : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে আগাছানাশক প্রয়োগ করলে আগাছা মরে যাবে কিন্তু ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন–গ্লাইফসেট প্রতিরোধী সয়াবিন উদ্ভিদ উদ্ভাবন।

নিচে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

(A) কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন–

(ক) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ : আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (Cotton bollworm) আক্রমণের ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেতো। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাই ব্যবহার করতে হতো ইনসেক্টিসাইড (insecticides = পতঙ্গনাশক)। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির ওপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভূট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও এখন Bt cotton, গোল্ডেন রাইস, লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধক্ষম আলু চাষের ট্রায়াল চলছে, কৃষক পর্যায়ে এখনও দেয়া হয় নি।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভূট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইফসেট (Glyphosate) একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮টি আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছানাশক দেয়া ভালো। কিন্তু ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়।

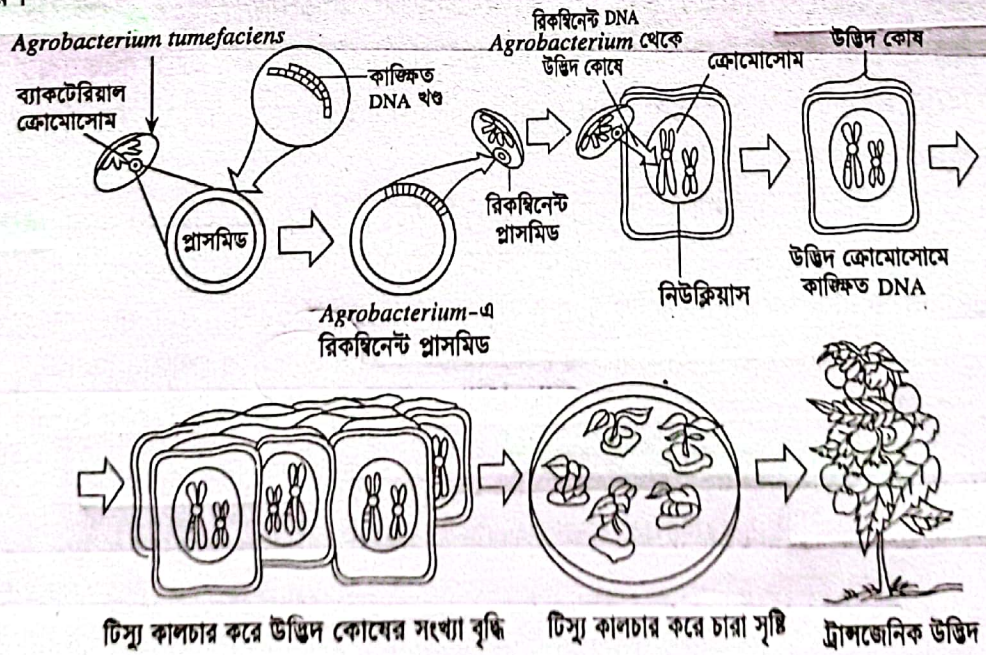

চিত্র ১১.৬ : ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি পদ্ধতি।

CamScanner

কতক ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইফসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানিগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এ জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভুক্ত করে ট্রান্সজেনিক তুলা ও ট্রান্সজেনিক সয়াবিন উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে গ্লাইফসেট হার্বিসাইড (glyphosate herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

(খ) গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা ক্লোভার জাতীয় ঘাস খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে **সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী** জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফারসমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিনসমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

(গ) সুপার রাইস (Super rice) বা গোল্ডেন রাইস (Golden rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুইডেনের বিজ্ঞানী Ingo Potrykus (1999) ও তাঁর সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন সুপার রাইস। তাঁরা *Japonica* টাইপ ধানে, ড্যাফোডিল থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এ ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। এখন সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়েছে।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর কোট প্রোটিন (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ঙ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে **'নিফ জিন'** (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

(চ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিতে : জোনাকি পোকার দেহে লুসিফারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে **'লুসিফেরিন'** নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা ওড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধক।

(ছ) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সারা বিশ্বের অনেক দেশে বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হচ্ছে; যেমন— জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই এক প্রতিফলন।

(জ) খরা প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি : *Bacillus subtilis* থেকে csp B জিন ভুট্টা উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে ভুট্টাকে খরা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে।

(ঝ) লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত সৃষ্টি : *Arabidopsis* থেকে At NHXI জিন প্রবেশ করিয়ে 'পীনাট' উদ্ভিদকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু করা সম্ভব হয়েছে।

CamScanner

(ঞ) ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী সৃষ্টি : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজিন সন্নিবেশিতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীকে **ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী** বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিন ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে প্রধানত গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত পদার্থের বা বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সফলভাবে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন কারণে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন করা হয়, যেমন—

১. গৃহপালিত পশুপাখিতে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে অনুপ্রবেশ করানো; ২। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করা; ৩। অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস ও মাছ এবং উন্নতমানের পশম উৎপাদন; ৪। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা; ৫। জিনের বহিঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা ইত্যাদি।

(ট) ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Production of insect pest resistant plant) : অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যারা ফসল উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরা হলো ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ insect pest। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এসব ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী ফসল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

(i) ইউরোপিয়ান কর্নবোরার (European corn-borer) এক প্রকার মথ। এদের লার্ভা ভুট্টা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে, ফলে ভুট্টার ফলন শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus thuringiensis*-এর একটি জিন ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ ক্ষতিকারক কর্নবোরার প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়াতে একটি প্রোটিন তৈরি হয় যা কীট-পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী 'জিন'কে ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে যা পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত ঐ প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে ভুট্টার ঐ নতুন উদ্ভাবিত জাত কর্নবোরার দ্বারা আক্রান্ত হয় না (কর্নবোরার নিজেরাই মরে যায়)। এর ফলে ভুট্টার ফলন হ্রাস পায় না, ফলন বাড়লে অথবা ফলন হ্রাস না পেলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না, তাই উৎপাদন খরচ আরও কমে যায়। এছাড়া ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে পুকুর, ডোবা, নদী-নালায় পড়ে জলজ ইকোসিস্টেমের যে মারাত্মক ক্ষতি করে তা থেকেও পরিবেশ রক্ষা পায়। ইনসেক্টিসাইড ছিটানো ফসল থেকে মানুষের দেহে ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড প্রবেশ করে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়।

কাজেই পতঙ্গনিরোধী ফসল উদ্ভিদ চাষে খরচ কম পড়ে, উৎপাদন বাড়ে, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা পায়।

(ii) *Bacillus thuringiensis* (Bt) একটি মৃত্তিকাবাসী বড়ো আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এটি বিরাজমান আছে। গবেষণাগারে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে বায়ো-ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ফসলে (যেমন বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদিতে) প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা পায়, ফলন হ্রাস পায় না, পরিবেশের এবং মানবদেহেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(iii) **স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (Sterile Insect Technique = SIT) :** এটি একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (যদিও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নয়)। SIT হলো একটি পরিবেশবান্ধব ক্ষতিকারক পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। Edward Kripling ও Raymond Bushland ১৯৩৭ সালে এ পদ্ধতির প্রস্তাবক। ফসলে বা জমিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পতঙ্গনাশক প্রয়োগ না করে বায়োলজিক্যাল ইনসেক্ট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পতঙ্গের পুরুষগুলোকে বন্ধ্যা করে দেয়া হয় (প্রধানত রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে)। এর ফলে স্ত্রী পতঙ্গসমূহ কার্যকর ডিম উৎপাদনে অক্ষম হয়, ফলে নতুন প্রজন্ম বিকশিত হতে পারে না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষতিকারক পতঙ্গটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মশা নিয়ন্ত্রণের এটি একটি কার্যকরী উপায়। আবার শাকসবজি ও ফলমূলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গও এ পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ সম্ভব না হলেও ব্রাজিল, জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন কৃষিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে পতঙ্গবাহিত (যেমন-মশা) রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন Insect Biotechnology গবেষণাগারে SIT নিয়ে গবেষণা চলছে।

CamScanner

ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
১। প্রবেশের প্রক্রিয়া	ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা জাইগোটে বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানো হয়।	ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়।
২। জিনগত পার্থক্য	বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	দুটি প্রাণীর নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
৩। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।
৪। জিনোমগত পার্থক্য	জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	জিনোমগত গঠন হুবহু এক।
৫। মিউটেশন বা প্রকরণ	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
৬। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা দেয়।	বাহ্যিক প্রকাশ হুবহু একই রকম।
৭। ব্যবহার	শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	কেবল ডিম্বাণুর খোলশ ব্যবহৃত হয়।

GMO কী ও কেন? : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization = WHO)-র সংজ্ঞানুযায়ী, যদি কোনো জীবের জেনেটিক পদার্থ (DNA) এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়, যে অবস্থায় এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে কখনোই পাওয়া যায় না সে ধরনের জীবকে **জিনগত পরিবর্তিত জীব** (Genetically Modified Organism = GMO) বলে। প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী, **গবেষণাগারে যে প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির DNA থেকে জিন সংগ্রহ করে সম্পর্কহীন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিনে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ ঘটিয়ে জিনগত পরিবর্তিত জীবের সৃষ্টি করা হয় তাকে GMO বলে।** GMO সৃষ্টির সময় ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, কীটপতঙ্গ, প্রাণী, এমনকি মানুষ থেকেও বহিরাগত জিন আহরিত হতে পারে। জিনতত্ত্বে যেসব নির্বাচনি বংশবৃদ্ধি (Selective breeding), টিস্যু কালচার, হাইব্রিডাইজেশন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয় তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়। GMO থেকে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে : প্রচলিত হাইব্রিডাইজেশনে ট্রান্সজেনিক জীবের (GMO) সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়।

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম GMO খাদ্য মানুষের আহারযোগ্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শস্য তুলা ও সয়াবিন গাছ GM (Genetically Modified) বলে জানা যায়। ২০১০ সালের শেষ দিকে বিশ্বের ২৯টি দেশের ৯.৮ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার (বিশ্বের চাষযোগ্য জমির প্রায় এক-দশমাংশ) জমি GM খাদ্য চাষের আওতায় চলে আসে। বর্তমানে ৫টি দেশ (যথা– আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, আমেরিকা, কানাডা, ইন্ডিয়া) বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ GM খাদ্যশস্য উৎপাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রথম GM (Genetically Modified) খাদ্য ফসল

জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩০টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified crop) উৎপাদন করছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন কী? *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন।

CamScanner

সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচিডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন-এ ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

পোকানাশক স্প্রে করলে কী হয়? বেগুন ক্ষেতে পোকানাশক স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসল রক্ষা পায়, তবে-

(i) বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিণামে ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী-নালা-খাল-বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।

(iv) কৃষকের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু কর্মঘণ্টা ব্যয় করে ওষুধ স্প্রে করতে হয়।

(v) ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এ বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। **এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়, আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

Bt-বেগুন চাষ করলে কী লাভ হবে?

Bt-বেগুন চাষ করলে কৃষক নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন।

(i) পোকানাশক ওষুধ কিনতে হবে না ও স্প্রে করতে হবে না। এতে হাজার হাজার টাকা উৎপাদন খরচ কম হবে।

(ii) আমরা যারা বেগুন খাই তারাও ঐ বিষ দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবো না এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকবো।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে।

(iv) আশেপাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকবে এবং জলজ পরিবেশের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

(v) উৎপাদন বাড়বে।

GM-ফসল কি ক্ষতিকর?

পরিবেশবাদীরা বরাবরই এর বিরোধিতা করে আসছে। যদিও তাদের কাছে এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমরা জানি প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ প্রোটিনই ঐ জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। কাজেই Bt-ক্রিস্টাল জিনও একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করবে। ঐ প্রোটিন আমাদের দেহে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিনা সেটাই প্রধান প্রশ্ন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, Bt-জিন বিশেষ পোকার জন্য বিষাক্ত হলেও মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। এছাড়া Bt-বেগুন উদ্ভাবনের পর পৃথিবীর উন্নত দেশে ১০টির অধিক গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর ওপর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। কাজেই আমরা দ্বিধাহীন মনে Bt-বেগুন খেতে পারবো।

(B) চিকিৎসা বিজ্ঞানে : চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিকা, হরমোন, অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন। রোগ শনাক্তকরণেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। সুস্থ সবল শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্তি নিয়ে আসছে আশার আলো।

মানুষের দেহের প্রতিটি কোষ ২৫০০০ পর্যন্ত কর্মক্ষম জিন বহন করে (আরো বহু জিন মানবদেহে আছে যাদের কাজ এখনো জানা সম্ভব হয়নি)। এর যেকোনো একটি নির্দিষ্ট জিন-এ ভ্রম (error) দেখা দিলে দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের এরূপ ৩৫০০টি জেনেটিক ডিসঅর্ডার জানা গেছে। আশা করা হচ্ছে এগুলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করা যাবে।

(i) ইনসুলিন (Insulin) উৎপাদন : ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন যা মানব অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর β (বিটা) কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের

(Pancreas) β (বিটা) কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। কোনো কারণে (i) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে অথবা (ii) কম নিঃসৃত হলে অথবা (iii) নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়। এমতাবস্থায় ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাই ইনসুলিনের চাহিদাও ব্যাপক।

Sir Edward Sharpy–Schafer সর্বপ্রথম ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইনসুলিন নামক হরমোন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন।

বিজ্ঞানী Federick Grant Banting এবং Charles Herbert Best ইনসুলিনের বহুমূত্র রোগ (diabetes) বিরোধী ভূমিকার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

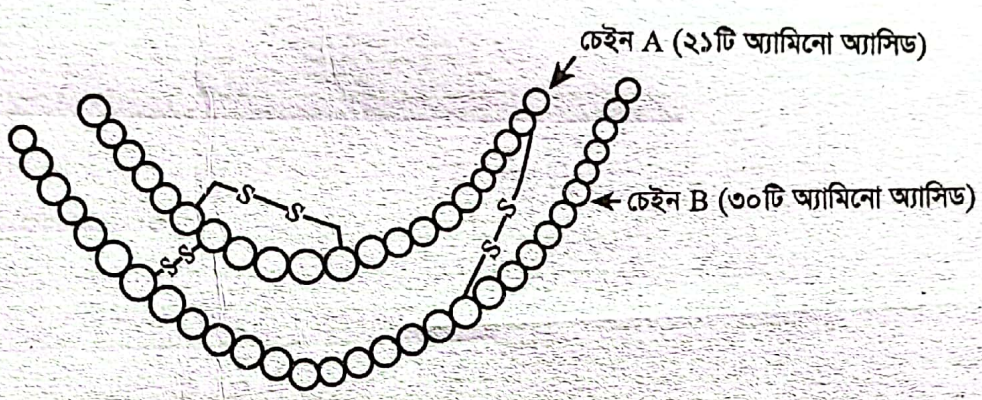

ইনসুলিনের A ও B চেইন। দুটি সিস্টিনের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়

ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-A এবং ৩০টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-B) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো : $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$, আণবিক ভর ৫৭৩৪। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন *E. coli*-তে স্থানান্তর করে ব্যাপক হারে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম কোষে প্রায় দশ লক্ষ অণু ইনসুলিন তৈরি হয়ে থাকে।

বর্তমানে কুসুম ফুলে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন প্রবেশ করানো হয়েছে। এর ফলে কুসুম ফুলের বীজ বা তেলে ইনসুলিন থাকবে। এতে খরচ বহুলাংশে কমে যাবে। এটি প্রায় চূড়ান্ত তবে এখনও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিতে এত ইনসুলিন কোথায়? একসময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু গরু বা শূকর থেকে নেয়া ইনসুলিন মানুষের জন্য ততটা উপযোগী নয়। কাজেই জিন প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এক সময় তা সফল হয়। প্রথমেই মানুষের DNA-তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তা হলো ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে। এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান।

জিন প্রকৌশল তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় 'হিউমুলিন' নামে।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

১। **ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ :** মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটির অবস্থান বর্তমানে শনাক্তকৃত। ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে এ জিন অবস্থিত। এটি ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত।

CamScanner

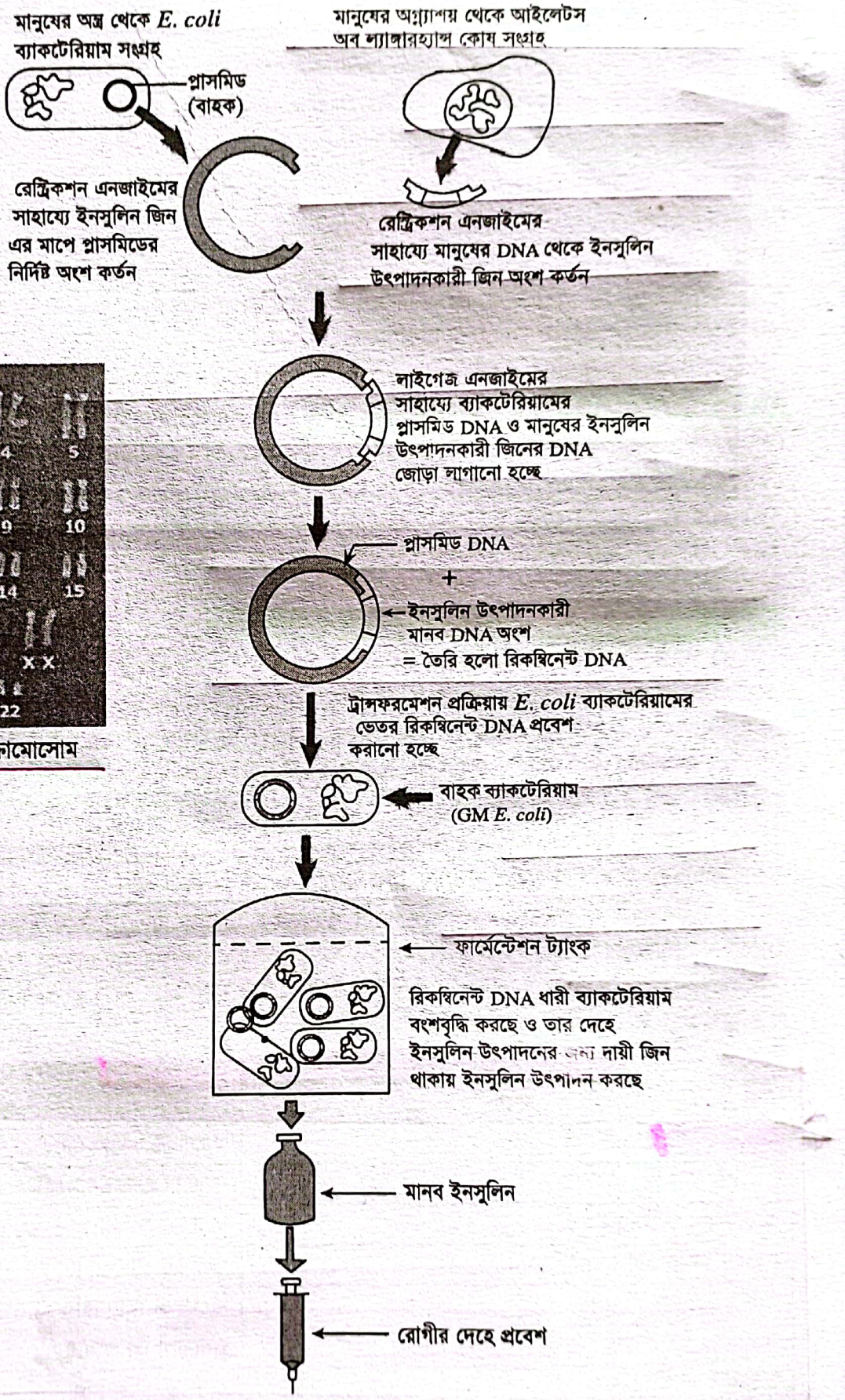

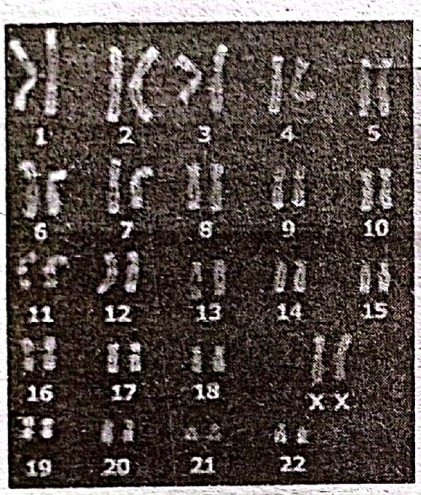

মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম

চিত্র ১১.৭ : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন তৈরি প্রক্রিয়া।

২। DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ : রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ বিশেষ উপায়ে কেটে পৃথক করা হয়।

৩। বাহক প্লাসমিড পৃথককরণ : ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাসমিড পৃথক করা হয়।

৪। *E. coli* প্লাসমিড DNA-এর একাংশ কর্তন : রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাসমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫। প্লাসমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন : প্লাসমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাসমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এবার তৈরি হলো রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড।

৬। রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড একটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো : এটি করা হয় ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায়। এটি হিট শক মেথড অথবা ইলেক্ট্রিক পাল্স মেথডে করা হয়। যে ব্যাকটেরিয়া রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড বহন করবে তাকে Vector (বাহক) বলা হয়। বাহক অবশ্যই নিজস্ব প্লাসমিড মুক্ত হতে হবে। প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য ভেক্টরকে Competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে ভেক্টরকে (*E. coli*) প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪-১৬ ঘণ্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E. coli*-এর কোষ প্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E. coli* কোষকে প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য Competent করে থাকে। এরপর *E. coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে একত্রে মিকচার করে একটি পাত্রে আধা ঘণ্টা বরফে, পরে ৪২°C তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E. coli* কোষ শোষণ করে প্লাসমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এবার *E. coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ **GMO *E. coli***-এ পরিণত হলো।

৭। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GMO *E. coli* সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ : এবার GMO *E. coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E. coli* সৃষ্টি হয় এবং সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮। ইনসুলিন পৃথকীকরণ : ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E. coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়।

৯। ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ : ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকা স্বাভাবিক। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

১০। ইনসুলিন বাজারজাতকরণ : উৎপাদন পরবর্তীতে উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে পুশ করা হয়। দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত কয়েকটি ওষুধ ও এদের প্রয়োগ/ব্যবহার

ওষুধ	প্রয়োগ
১। ইনসুলিন	ডায়াবেটিস চিকিৎসায়
২। ইন্টারফেরন	ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণে
৩। সেরাম অ্যালবিউমিন	শল্য চিকিৎসায়
৪। র‍্যাবিস ভাইরাস অ্যান্টিজেন	জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায়
৫। হিউমেন ফ্যাক্টর IV	হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায়
৬। টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর (tPA)	হৃদরোগ চিকিৎসায়
৭। সোমাটোস্ট্যাটিন	বামনত্ব চিকিৎসায়
৮। হিউমেন ইউরোকাইনেজ	রক্ত সংবহন জটিলতা, প্লাজমিনোজেন সক্রিয়ক
৯। লিম্ফে. ইনস	স্বয়ংক্রিয় ইমিউন কার্যকারিতায়

CamScanner

কাজ : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি একটি পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে ক্লাসে/তোমার পড়ার ঘরে টানিয়ে দাও।

(ii) ইন্টারফেরনস (Interferons) উৎপাদন : ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, তেমনই বহিরাগত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, বিষ, অন্য কোনো বস্তু ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি মানবদেহে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে, এটি দেহের **ইমিউন সিস্টেম** (immune system)। **ইন্টারফেরন হলো প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র** (chemical defence) যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের অন্তর্গত। **এক কথায়, ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন** (defence protein)। কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসরণ করে। নিঃসৃত ইন্টারফেরন আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে ভাইরাসটি আর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না এবং পরবর্তী কোষগুলোকে আর আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই সংক্রমিত কোষের চারপাশের কোষগুলো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, অধিকন্তু এরা ভাইরাস-প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। কাজেই ইন্টারফেরনের কাজ হলো আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়া এবং সুস্থ কোষগুলোকে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম করে তোলা ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alick Isaacs & Jean Lindermann ১৯৫৭ সালে ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।**

ইন্টারফেরনের ব্যবহার : ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির হরমোন, এমনকি একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু থেকে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেরন তৈরি হয়। ভাইরাস আক্রান্ত লিউকোসাইট থেকে এক ধরনের ইন্টারফেরন, ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে অন্য ধরনের ইন্টারফেরন নিঃসরণ হয়। ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোষ কর্তৃক ইন্টারফেরন নিঃসৃত হলেও বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে ইন্টারফেরন উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে জটিল হেপাটাইটিস-B, কতক হার্পিস সংক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের প্যাপিলোমা (Papilloma) চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জলাতঙ্ক (rabies) রোগের চিকিৎসায়ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষকগণ ধারণা করছেন যে, ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রহিত করতে ইন্টারফেরন সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে। **ইন্টারফেরন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।**

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১। মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে DNA আহরণ করা হয় এবং তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন পৃথক করা হয়।

২। একটি উপযুক্ত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।

৩। এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে প্লাসমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটি রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করা হয়।

৪। ইন্টারফেরন জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়।

৫। এবার আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বিশিষ্ট *E. coli*-এর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি করা হয়। *E. coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টারফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।

৬। আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।

৭। বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এরূপ একটি ইন্টারফেরনের বাণিজ্যিক নাম **Betaferon.**

(iii) টিস্যু প্লাসমিনোজেন অ্যাকটিভেটর উৎপাদন (Tissue Plasminogen Activetor = TPA) : মানুষের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক করতে পারে অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সাথে সাথে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে Streptokinase এনজাইম পাওয়া গেল যা দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এ প্রোটিনটি মানুষের নিজস্ব প্রোটিন নয় বিধায় দেহে বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

CamScanner

মানুষের রক্তে এমনিতেই প্লাজমিন এনজাইম (Plasmin enzyme) থাকে যা Plasminogen অবস্থায় বিরাজ করে। প্লাজমিনোজেন নিষ্ক্রিয় (inactive) অবস্থায় থাকে। প্লাজমিনোজেনকে কর্মক্ষম অবস্থায় আনতে হলে TPA-এর দরকার হয়।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

(i) মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা।

(ii) mRNA থেকে cDNA তৈরি করা।

(iii) cDNA-কে উপযুক্ত প্লাসমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা।

(iv) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো।

(v) আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli*-কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা।

(vi) *E. coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা।

(vii) হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ব্লক বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

(viii) TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

(iv) ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO) তৈরি : আমাদের কিডনি ইরিথ্রোপোইটিন (EPO) নামক একটি হরমোন তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহের সাথে বোনম্যারো (bone marrow)-তে প্রবেশ করে। EPO, বোনম্যারো কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রচুর RBC (লোহিত রক্ত কণিকা) উৎপন্ন হয়। যাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় বা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। ডায়ালাইসিস-এর সময় এ হরমোনও (EPO) রক্ত থেকে বের হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে RBC একেবারেই কমে যায়, রোগী তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে।

EPO তৈরি প্রক্রিয়া : নিম্নে EPO তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(i) মানুষের দেহ থেকে EPO জিন পৃথক করা। (ii) পরে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করে এ জিনকে উপযুক্ত বাহকে (প্লাসমিড) অন্তর্ভুক্ত করা। (iii) পরে এ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে অপর ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করানো। (iv) রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে হাজার হাজার কপি করা। (v) *E. coli* থেকে EPO প্রোটিন নিষ্কাশন করে ওষুধ হিসেবে প্রস্তুত করা। বর্তমানে হাজার হাজার কিডনি রোগীকে রক্তশূন্যতা দূরীকরণার্থে *E. coli*-তে উৎপন্ন EPO ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে।

(v) জিন থেরাপি (Gene therapy) : কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো জিন থেরাপি। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে; যথা : (i) গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা (ii) একটি বাহক (vector), সাধারণত একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

ভাইরাস কোনো কোষে প্রবেশ করে তার নিজস্ব DNA কে আক্রান্ত কোষের ক্রোমোসোমে সংযুক্ত করতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে (i) ভাইরাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কোষে ড্রাগ প্রবেশ করানো যায়। (ii) কাঙ্ক্ষিত জিন প্রবেশ করানো হয় এবং (iii) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সালে জিন থেরাপি প্রয়োগে একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে।

(vi) Hepatitis-B ভাইরাস-এর অ্যান্টিজেন তৈরি জিন TMV-এর মাধ্যমে তামাক গাছে প্রবেশ করিয়ে তামাককে হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন উপযোগী করা হয়েছে। প্রচলিত ভ্যাকসিনের মতো তামাককে আর রেফ্রিজারেটরে রাখা লাগবে না। গ্রামাঞ্চলে সরাসরি এটি ভ্যাকসিন হিসেবে খাওয়া যাবে। এটি এখনও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

CamScanner

(vii) ভুট্টাতে ওরাল ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হচ্ছে। এটিও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

(viii) **গর্ভের শিশু পরীক্ষা :** মাতৃগর্ভের শিশু কোনো বংশগত বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিনা তা 'অ্যামনিওসিস' নামক জিন প্রযুক্তি দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

(C) মলিকুলার ফার্মিং : ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদেরকে বায়ো-রিঅ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়ে থাকে।

(D) বায়োফার্মিং (Biopharming) : যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড়ো মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে বায়োফার্মিং বলে। (i) জীবন রক্ষাকারী **antithrombin** এখন অতি অল্প খরচে ছাগলের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। (ii) GMO ছাগলের দুধ থেকে শক্তিশালী **spider silk** উৎপাদন করা হচ্ছে। (iii) ইনসুলিন এখন কুসুম ফুলের বীজের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। এতে খরচ খুবই কমে যাবে (উন্মুক্ত হয়নি)।

(E) পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় (Environmental Management) : যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা যায়, পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। জীবজগতের বসবাসের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(ক) কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য : কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং জিঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা single cell protein হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (dairy) কারখানা হতে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কাগজ ও কাগজের মণ্ড (pulp এবং paper industry) থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে *Torula* নামক ঈস্ট জন্মায় যার মধ্যে প্রচুর আমিষ থাকে। *Saccharomyces cerevisiae* এবং *Torula utilis* বর্জ্য পদার্থের মধ্যে জন্মায়। এদের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

কাগজ শিল্পের কাঁচামাল ব্লিচ করতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন— বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, গ্লুটানল ইত্যাদি।

(খ) সমুদ্রে নির্গত তেল পরিশোধন : দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নানা উপায়ে সমুদ্রে তেল-এর মাধ্যমে দূষণ (pollution) ঘটতে পারে এবং তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। তেল পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানি অপেক্ষা হালকা বলে তা পানির ওপর ভাসতে থাকে এবং চকচকে একটি স্তরের সৃষ্টি করে। তেলের এ স্তর সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু সমুদ্রে যে সমস্ত **হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব** বাস করে তারা অদ্রবণীয় তেল দানার সাথে লেগে থেকে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তেলকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে এবং তেল দূষণ থেকে মুক্ত করে। তবে কোনো উপায়ে তেল সমুদ্রের তলায় চলে আসলে বছরের পর বছর তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কারণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এ অণুজীবগুলো কাজ করে না। *Pseudomonas, Nocardia, Mycobacteria*, বিশেষ ধরনের ঈস্ট ও মোল্ডজাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে।

CamScanner

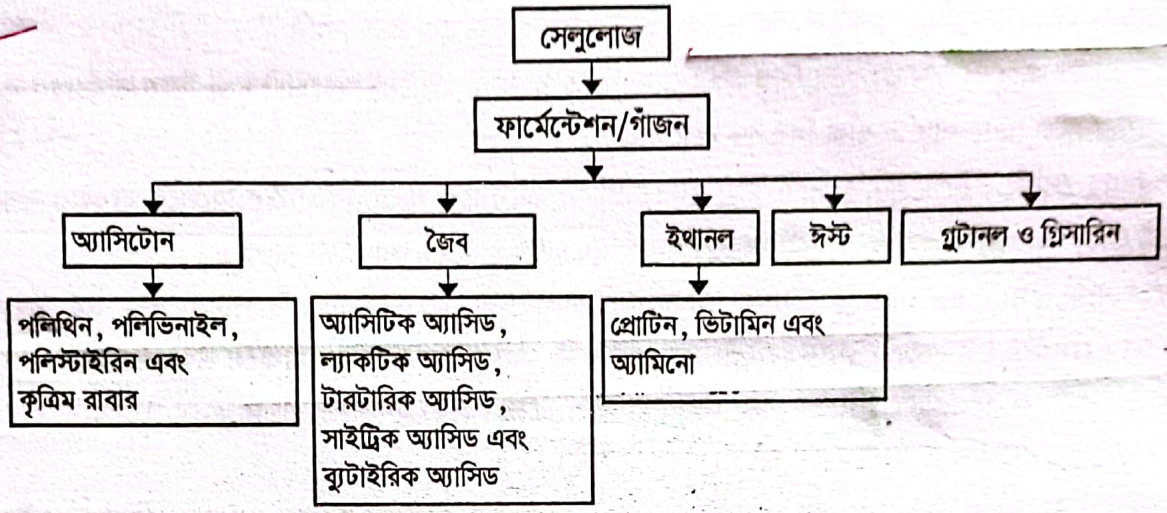

ছক : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন।

জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রকরণের *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে যা তেল হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত নষ্ট করে দিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে পারে।

(গ) পয়ঃবর্জ্য বা সিউয়েজ আত্তীকরণ : ঘরবাড়ি, মহল্লা বা কৃষিখামার হতে নির্গত মলমূত্র ও জঞ্জালকে সিউয়ে (sewage) বা নর্দমার ময়লা বলে। অনেক সময় ঝড়বৃষ্টির পরিত্যক্ত পানিও ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিউয়েে পরিণত হয়। রোগ উৎপাদনকারী পরজীবীসহ জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে সিউয়েজ গঠিত। অজৈব পদার্থ যেমন— কাদ বালি এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলাদা করা হয়। জৈব পদার্থ পানি দূষণের অন্যত কারণ। তাই সিউয়েজ পানি যাতে খাবার বা ব্যবহার্য পানির সাথে মিশতে না পারে সেজন্য উন্নত দেশে জৈবিক উপা পরিশোধন করা হয়। বায়বীয় বা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়াসহ শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এ জৈব পদার্থকে ভেঙে CO_2 ও CH_4 -এ পরিণত করে। CH_4 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং CO_2 গ্যাসীয় অবস্থ বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পায়। জৈবিক বিক্রিয়ার পর মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ করে পানি নদী বা সাগরে ফেলা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশ বাংলাদেশে সিউয়েজ বিশুদ্ধকরণ করা হয় না বললেই চলে।

বর্তমানে সিউয়েজ আত্তীকরণের সুবিধার জন্য কিছু নির্বাচিত অণুজীবের স্টার্টার কালচার তৈরি করা হয়েছে। এছা সিউয়েজ আত্তীকরণের কিছু প্লান্টও উদ্ভাবিত হয়েছে। এসবের উদ্ভাবনের ফলে সিউয়েজ আত্তীকরণ আরও সহজস হয়েছে।

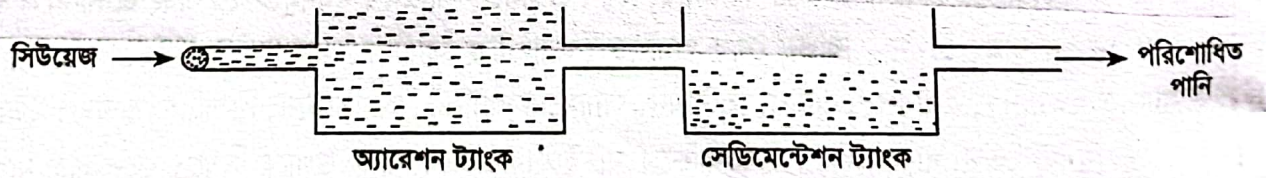

চিত্র ১১.৮ : এক্টিভেটেড স্ল্যাজ পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন।

বর্তমানে সারা বিশ্বে **এক্টিভেটেড স্ল্যাজ** (activated sludge) পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন করে পরিশোধিত প নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। এটি একটি সহজ জীবজ পদ্ধতি, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে। এ পদ্ধতিতে **অ্যারেশন ট্যাংক** **সেডিমেন্টেশন ট্যাংক** নামক দুটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। প্রথম ট্যাংকে বিভিন্ন অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যা সমৃদ্ধ থাকে যারা জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে CO_2 ও পানিতে পরিণত করে। দ্বিতীয় ট্যাংকে পানিকে স্থিতিশীল রাখা হয় ফলে তলানি জমা হয় এবং ওপরে পরিশোধিত পানি থাকে, যা নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। তলানি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাজে ব্যবহৃত একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকটেরিয়াম হলো ***Zooglea ramigera.***

CamScanner

জীবপ্রযুক্তির কিছু সম্ভাবনাময় (Prospects of Biotechnology) ক্ষেত্র

সারা বিশ্বের অনেক সমস্যা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের যত্ন, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ। নিচে জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

১। **জিন থেরাপি ও আরএনএআই (Gene therapy & RNAi) :** বংশগতীয় রোগ, ক্যান্সার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে corrected জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi ও জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।

২। **মাইক্রো আরএনএ (Micro RNA) :** ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ— এসব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক বিশেষ প্রয়োগ। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।

৩। **স্টেম সেল :** জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্টেম সেল কোষ সৃষ্টি করে হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন, যেকোনো অঙ্গের কোষ তৈরি, নতুন ওষুধের পরীক্ষা ইত্যাদি পূর্বের চেয়ে সহজতর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪। **জিনোম স্ক্যানিং :** জিনোম স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত যেকোনো জীবের জিনোম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হবে।

৫। **ন্যানোটেকনোলজি :** চাহিদা অনুসারে জৈববস্তুর উৎপাদন করার জন্য ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হবে।

৬। **GM অণুজীব :** অণুজীব ব্যবহার করে পরিবেশের দূষণমাত্রা রোধ করা সম্ভব হবে।

৭। **কৃষকের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন :** জীবপ্রযুক্তি কৃষকের বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করছে এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করছে। নিকট ভবিষ্যতে কম দূষকযুক্ত কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome sequencing)

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন গঠন বা ধরনের হয়। কোনো একটি প্রজাতির একটি নিউক্লিয়াসে সাধারণত ক্রোমোসোমের একটি সেটকে বলা হয় জিনোম (genome)। হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম থাকে, আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি জোড়ার একটি করে ২৩টি ক্রোমোসোম মিলিতভাবে গঠন করে মানুষের জিনোম। কাজেই মানুষের দেহকোষে এক জোড়া জিনোম আছে।

২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ইমানুয়েল কার্পেন্টার ও মার্কিন বিজ্ঞানী জেনিফার এ ডৌডানা। জিনোম সম্পাদনার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এ প্রযুক্তির নাম হলো ক্রিস্পার ক্যাস নাইন জেনেটিক সিজার্স। জীবিত কোষে থাকা DNA-র মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন আনার উপায় এটি।

ক্রোমোসোমের মূল উপাদান DNA এবং DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে। কাজেই বলা যায়, একটি জীবে এক সেট ক্রোমোসোমে অবস্থিত সকল জিনসহ পূর্ণাঙ্গ DNA-ই জিনোম। সহজভাবে একটি জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে একত্রে জিনোম বলা হয়। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের 'মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট' বলা হয়।

আমরা জানি অসংখ্য নিউক্লিওটাইড বিভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে DNA অণু গঠন করে। এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, এক অণু নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডিনিন = A, গুয়ানিন = G, থাইমিন = T এবং সাইটোসিন = C) এবং এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক একটি নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে (কোনটির পর কোনটি) সজ্জিত থাকে তা হলো জিনোম সিকোয়েন্স, আর এই সিকোয়েন্সটি (সাজানো পদ্ধতিটি) উদঘাটন করাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং।

CamScanner

একটি DNA স্ট্যান্ড-এর বেস্-পেয়ার (basepairs) সাজানো ক্রম যে প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা হয় তাকে DNA সিকোয়েন্সিং বলে (A process in which the sequence of basepairs in a DNA strands is determined, is known as DNA sequencing.)।

জিনোম সিকোয়েন্সিং কাজটি উন্নত প্রযুক্তি ও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্ভর। লম্বা DNA অণুটি একসাথে সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয় না, তাই DNA অণুকে উপযুক্ত দূরত্বে কেটে নেয়া হয় এবং খণ্ডগুলোর সিকোয়েন্সিং করে একসাথে মিলিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সিং উপস্থাপন করা হয়। তবে প্রথম দিকে প্রক্রিয়াটি যত ব্যয়বহুল ছিল বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যয় বহুলাংশে কমে এসেছে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রবর্তক হলেন **Dr. F. Sanger**, যিনি পরবর্তীতে এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রক্রিয়াটি এরূপ : (i) প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট DNA অণুকে রিএজেন্ট সমৃদ্ধ চারটি টিস্টটিউবে ভাগ করে দেয়া হয়, যেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি DNA খণ্ডের A.T.G.C রেসিডিউ শনাক্ত করবে। (ii) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পাশাপাশি চারটি বিক্রিয়ার প্রতিটিকে পৃথক করা হয় এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যান্ড-এর স্থান ও পরিমাণ (size) থেকে সিকোয়েন্স নির্ণয় করা হয়। (iii) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত X-ray স্ক্যানার ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং : বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি। এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার ফলে এখন উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

অধ্যাপক তোফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি গবেষণাগারে মিলিত গবেষণায় বারমাসী কাঁঠালের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। এর জিনোম ১.০৪ গিগা বেস পেয়ার সমৃদ্ধ।

ফসলী উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং : মুগডাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম ডাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। কিন্তু হলুদ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণে এ ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও গবেষণা সহযোগী দল বাংলাদেশে মুগের হলুদ রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন এবং RNAi পদ্ধতি ব্যবহার করে হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা করছেন। তাঁর দল ICGEB-র আর্থিক সহায়তায় টমেটোর পাতা কোকড়ানো (Tomato leafcurl) রোগ সৃষ্টিকারী ToLCV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ToLCV প্রতিরোধী টমেটো জাত উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প (BCSIR) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা নভেল করোনো ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেছেন।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	ক্ষারজোড়
E. coli	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
Haemophilus influenzae	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
Yeast	১৬	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদ)	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
মানুষ	৪৬	২৫০০০ (+ বহু অপ্রকাশিত)	৩.২ বিলিয়ন

CamScanner

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger print)

DNA finger prints বুঝতে হলে প্রথমে finger prints সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফিঙ্গার প্রিন্টস বলতে সাধারণত মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ একই রকম হয় না (ক্লোনিং ও আইডেনটিক্যাল টুইন ব্যতীত)। তাই জমিজমা হস্তান্তর বা রেজিস্ট্রি, কাবিননামা রেজিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সীম নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট রাখা হয়। দুজন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের ভিন্নতা হয় জিন তথা DNA (A.T.G.C) এর ভিন্নতার কারণে। কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস (Gel electrophoresis)-এর মাধ্যমে (উক্ত DNA এর) যে ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে **DNA finger print** বা **DNA profile** বলে। DNA finger print প্রত্যেক ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয় (unique) [A pattern of bands on a gel that is unique to each individual is DNA finger print]

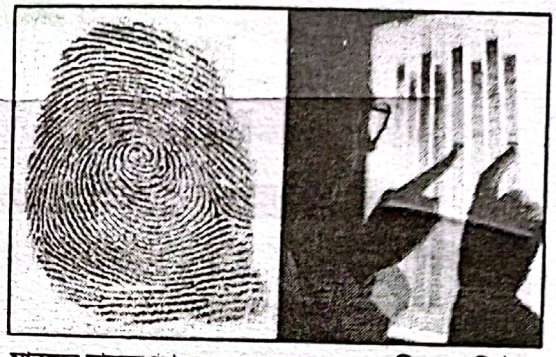

মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট

প্রথমে কোনো জীব তথা মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস-এর মাধ্যমে জেল স্তরের ওপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড়ো থেকে ছোটো হিসেবে কতগুলো সারিবদ্ধ ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পরিক অবস্থান জানা যায়। প্রত্যেক জীব তথা মানুষের DNA খণ্ডগুলোর এমন ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা চিত্রকে DNA finger print বা DNA profile বলে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing)

কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে জানা যায় ঐ প্রজাতির DNA অণুতে অবস্থিত ATGC গুলো কোনটার পর কোনটার অবস্থান অর্থাৎ এদের অনুক্রম। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে সব অংশে ATGC একই অনুক্রমে অবস্থান করে না, কখনো কখনো একই সাথে পরপর একাধিক A বা একাধিক T থাকতে পারে।

কোনো জীবের জীবনরহস্য জানার প্রথম ধাপ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানলেই জীবের সমস্ত জেনেটিক তথ্য জানা যায় না। সিকোয়েন্সিং-এর পর জানা সহজ হয় কোথায় কোন জিনের অবস্থান, জিনের গঠন, জিনের পরিধি এবং কোন জিনের কি কাজ। কোনো জিনের অবস্থান, গঠন, পরিধি ও কাজ জানতে পারলেই ঐ জিনটিকে ব্যবহার করা যায়।

DNA ফরেনসিক্স (DNA Forensics)

(১) **অপরাধী শনাক্তকরণে :** ভিক্টিম বা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান থেকে আলামত সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। এরপর সন্দেহভাজন তালিকা ধরে তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। যার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে আলামত থেকে নেয়া সিকোয়েন্সিং এর মিল হবে সেই প্রকৃত অপরাধী। অজ্ঞাত বা খুন হওয়া ব্যক্তির পরিচয় জানতে DNA সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির DNA সিকোয়েন্সিং করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

(২) **পিতৃত্ব নির্ধারণে :** অনেক সময় সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে পিতৃত্ব দাবিকৃত ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিলিয়ে দেখা হয়। যার জিনোমের সাথে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিল সম্পন্ন হবে, তিনিই হবেন সন্তানের প্রকৃত পিতা।

(৩) **স্বজন নির্ধারণে :** সাভারে রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনায় পরিচয়হীন শ্রমিকদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে তার সাথে তার দাবিকৃত আত্মীয়দের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে মিল পাওয়ার পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়া হয়েছে।

CamScanner

(৪) **শ্রেণিবিন্যাসের স্তর নির্ধারণ :** জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা হলো আর্কিব্যাক্টেরিয়া, ব্যাক্টেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকেও পৃথক, কারণ ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন অন্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক অধিরাজ্য (Domain) করা হয়েছে।

(৫) **শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যের মিল নির্ধারণে :** আর্কিব্যাক্টেরিয়ার rRNA এর বেস সিকোয়েন্স ব্যাক্টেরিয়ার সাথে মিল সম্পন্ন। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাক্টেরিয়া ঘনিষ্ঠতম।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

১। যেকোনো প্রকৃতির জীব থেকে বিশেষ কোনো জিনকে শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পৃথক করা; যেমন— মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন। এটি ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে অবস্থিত। (চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

২। উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী জিন অনুসন্ধান করা; যেমন— Bt toxin জিন Cry1AC এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45 (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৩। উদ্ভিদের মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন অনুসন্ধান এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সফলভাবে ব্যবহার করা; যেমন— গোল্ডেন রাইস এর বিটা-ক্যারোটিন জিন। (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)

৪। জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য উদ্ভিদ বা অণুজীবের **মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ;** যেমন— ধান, পাট, ভূট্টা ইত্যাদি ফসলের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য অন্যান্য মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ।

৫। গবাদি পশুর মাংস, দুধের পুষ্টি গুণাগুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে জিনোম সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬। মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্বারা মানব জিনোমের অনেক তথ্যই এখন উন্মোচিত হয়েছে, ফলে এ তথ্যসমূহ চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে; যেমন— ইনসুলিন জিন-এর প্রয়োগ।

৭। যেকোনো জীবে জিনের প্রকাশ (expression of gene) কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং এই তথ্যসমূহ **গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ।**

৮। ধর্ষণকৃত মহিলার গোপন অঙ্গ থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণু অথবা কাপড় ও শরীরে অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণুর DNA পরীক্ষা করে ধর্ষণকারীর রক্তের DNA-এর মিল দেখে ধর্ষণকারী নির্ধারণ করা যায়।

৯। হাসপাতালে যদি কোনো নবজাতক বদল হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বদল করা হয় তবে মা এবং বাচ্চার কোষের DNA পরীক্ষা করে বাচ্চার মা শনাক্ত করা যায়।

১০। দুর্ঘটনায় নিহত ও বিকৃত নামের শনাক্তকরণেও জিনোম সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করা যায়।

১১। জীবতথ্য বিদ্যার (Bioinformatics) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিনোম সিকোয়েন্সিং উপাত্ত থেকে গ্রহণ করা।

১২। বন্য জীবজন্তু যেমন— সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে DNA সিকোয়েন্সিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৩। এছাড়া জৈব জ্বালানি উদ্ভাবন, ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারফেরন উৎপাদন ও ক্যান্সার গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কাজ : জীবপ্রযুক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগসমূহ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

CamScanner

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তার (Biosafety) বিধানসমূহ

সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যাণের জন্যই অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভারসাম্য অবস্থা। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের ব্যবহারের মাধ্যমে জানা হয়েছে কোনটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, আর কোনটি ক্ষতিকারক নয়। এরপরও কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কোনো প্রাকৃতিক বস্তু গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য অন্য কাউকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই। যে বিষয়ের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন সংক্রামক ও GMOs (Genetically Modified Organisms) এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে সংরক্ষিত করা হয় তাকে জীবনিরাপত্তা (biosafety) বলে।

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহার করার পূর্বে জেনে নিতে হবে এটি মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি-না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে এ বেগুন খেলে মানুষের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিনা। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এ Bt বেগুন মানুষের ইমিউন সিস্টেমের বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের ওপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এ নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। এ নির্দেশিকার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।

এ Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি (Biosafety Core Committee), মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (Field Level Biosafety Committee) এবং জীব নিরাপত্তা অফিসার (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১। জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

২। GMO প্রয়োগের/ ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

৩। জীববৈচিত্র্য প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর GMO-এর ক্ষতিকারক দিক নির্ণয় করা এবং তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৪। GMO ক্ষতিকারক নয় প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

ঝুঁকি নির্ধারণ

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ওপর কোনো GMOs বা LMOs (Living Modified Organisms) এর কী ধরনের প্রতিকূল প্রভাব থাকতে পারে তার ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। Cartagena Protocol এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষাধীন GMOs/LMOs এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক হলে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা বিবেচনা করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

CamScanner

ঝুঁকি নির্ধারণ পদ্ধতি : ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষের অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাদের সহায়তা নিতে হবে। ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

১। পরীক্ষাধীন GMO/LMO-র এমন কোনো জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত হয় যা জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অতিদ্রুত তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

২। সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা কতটুকু তা নির্ধারণ করতে হবে।

৩। নির্ধারিত বিরূপ প্রভাবের পরিণতি কী হতে পারে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। মূল্যায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরীক্ষাধীন GMO/LMO-এর সার্বিক ঝুঁকি ও সম্ভাব্য পরিণতি অনুধাবন করা যাবে।

৫। সর্বশেষ ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করে সুপারিশ করতে হবে।

গবেষণাগারে GMOs/LMOs নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ :

১। গবেষণার মূলনীতি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

২। দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষক নিশ্চিত করতে হবে।

৩। গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৪। গবেষণাগারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা বিধানসমূহ অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলো অনুসন্ধান করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে GMOs/LMOs ব্যবহার বা অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ :

১। মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

২। যে পরিবেশে এদের প্রয়োগ করা হবে তার ওপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।

৩। GMOs/LMOs এর জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।

৪। কোনো GMOs/LMOs এর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা যাবে না।

সার-সংক্ষেপ

টিস্যু কালচার : গবেষণাগারে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যুর সংখ্যাবৃদ্ধিই টিস্যু কালচার। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ে হাজার হাজার চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো একই বয়সের হয় এবং গুণগত মান বজায় থাকে, ফলে ফলন বাড়ে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাইরাসমুক্ত বীজ তৈরি করা হয়, ফলে ফসল ভাইরাস আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে এবং ফলন হ্রাস পায় না, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে প্রতিস্থাপন করাই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল। এতে দুটি পৃথক DNA-এর অংশের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির DNA তৈরি হয়, যাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA। রিকম্বিনেন্ট DNA দিয়ে তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে বলা হয় GMO (genetically modified organism)। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে পতঙ্গবিরোধী ভুট্টা, ভাইরাস বিরোধী পেঁপে, সুপার রাইস, ইনসুলিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে।

CamScanner

প্লাসমিড : বিভিন্ন অণুজীবে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া কোষে তাদের মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক বৃত্তাকার DNA থাকে। ক্রোমোসোম বহির্ভূত এসব বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় প্লাসমিড। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান Laderberg ১৯৫২ সালে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্লাসমিড অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপাদান। প্লাসমিড বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রা থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। দেহে ইনসুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন দুটি ডাই-সালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইনসুলিন গঠন করে। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন নিঃসরণকারী জিনকে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগ চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো ইনস্যুলিন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং : কোনো জীবের জিনোমস্থ DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে নিউক্লিওটাইডসমূহ (ATGC) কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং। কোনো জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন হলে তার বিভিন্ন জিনের অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা সহজ হয়। জিনের অবস্থান ও কাজ জানা গেলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা সম্ভব হয়। GMO = Genetically Modified Organism; LMO = Living Modified Organism।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। বায়োটেকনোলজি শব্দটি ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky)।

২। প্রাচীনতম বায়োটেকনোলজি বা জীবপ্রযুক্তির একটি উদাহরণ হলো দুধ থেকে দই তৈরি।

৩। জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবকল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা কোনো দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো **জীবপ্রযুক্তি** বা **বায়োটেকনোলজি** (কোলম্যান-১৯৬৮)।

৪। ব্লু-বায়োটেকনোলজি বলতে বায়োটেকনোলজির সামুদ্রিক প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৫। গ্রিন বায়োটেকনোলজি বলতে বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৬। রেড এ্যান্ড হোয়াইট বায়োটেকনোলজি বলতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৭। উদ্ভিদের বিভাজনে সক্ষম কোনো অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে **টিস্যুকালচার** বলে।

৮। উদ্ভিদের প্রতিটি সজীব কোষের একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বলা হয় **টটিপটেন্সি**।

৯। উদ্ভিদের অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি প্রক্রিয়াকে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** বলা হয়।

১০। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Habarlandt কে টিস্যুকালচার প্রযুক্তির জনক বলা হয়।

১১। গবেষণাগারে কাচপাত্রে কালচার করাকে *In-vitro* কালচার বলা হয়।

১২। টিস্যুকালচারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদাংশকে **এক্সপ্লান্ট** বলা হয়।

১৩। এক্সপ্লান্ট থেকে সৃষ্ট অবয়বহীন টিস্যুগুচ্ছকে **ক্যালাস** বলা হয়।

১৪। কোনো জীবকোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন নিয়ে অন্য কোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা অথবা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়।

CamScanner

১৫। কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সৃষ্ট জীবকে GMO (Genetically Modified Organism) বা GEO (Genetically Enginered Organism) বলা হয়।

১৬। একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-এর অংশ (জিন) কেটে নিয়ে অন্য জীবের কোষের DNA-এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে সৃষ্ট নতুন প্রকৃতির DNA-কে Recombinant DNA বলে।

১৭। জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় তাকে **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে।**

১৮। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়া যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু বিরাজ করে তাকে **প্লাসমিড** বলে।

১৯। Laderberg ১৯৫২ সনে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান।

২০। ট্রান্সজেনিক ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে *E. coli, Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া অধিকহারে ব্যবহার করা হয়।

২১। যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স কেটে নেয়া যায় সেই এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। যে সিকোয়েন্সকে কেটে নেয়া হয় তাকে **রেস্ট্রিকশন সাইট** বা **রিকগনিশন সাইট** বলা হয়।

২২। রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যাকটেরিয়াতেই তৈরি হয়। কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম হলো Bam HI, Hind III, Eco RI ইত্যাদি।

২৩। কাঙ্ক্ষিত নতুন জিনের অন্তর্ভুক্তির ফলে সৃষ্ট নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** বলে।

২৪। রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক কোষে প্রবেশ করানোর জন্য নিম্নলিখিত যেকোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় : ভৌতিক প্রক্রিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া অথবা ভেক্টর প্রক্রিয়া।

২৫। কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করাই হলো **জিন ক্লোনিং**।

২৬। পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনকে সংক্ষেপে PCR বলা হয়।

২৭। জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপন্ন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। Bt-বেগুন একটি GM ফসল। *Bacillus thuringiensis* এর জিন অন্তর্ভুক্তিকে Bt-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২৮। দুটি চেইন-এ মোট ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে মানুষের **ইনসুলিন** গঠিত।

২৯। মানুষের ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অবস্থিত।

৩০। হিউমুলিন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে সৃষ্ট ইনসুলিনের ট্রেড নাম।

৩১। **ইন্টারফেরন** হলো একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন যা সাধারণত কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেহে তৈরি হয়।

৩২। TPA হলো Tissue Plasminogen Activator এর সংক্ষিপ্ত রূপ। TPA জমাট রক্ত তরল করার নিষ্ক্রি এনজাইম Plasminogen কে সক্রিয় করে তোলে।

৩৩। মানবদেহে কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সংশোধন করার পদ্ধতি হলো জিনথেরাপি।

৩৪। কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বৃহত্তর জীবের মাধমে অধিক মাত্রায় উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো বায়োফার্মি (Biopharming), যেমন ছাগলের মাধ্যমে অ্যান্টিথ্রমবিন উৎপাদন।

৩৫। তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত পরিবর্তন করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া।

CamScanner

৩৬। কোনো জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে ঐ জীবকোষ তথা ঐ জীবের জিনোম বলা হয়।

৩৭। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট বলা হয়।

৩৮। কোনো DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলোর অনুক্রমিক সাজানো পদ্ধতি হলো ঐ DNA অণুর জিনোম সিকোয়েন্স। কোনো DNA অণুর জিনোম সিকোয়েন্স উদঘাটন পদ্ধতি হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং।

৩৯। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল হক (এখন প্রয়াত) ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন, যাতে বেসপেয়ার আছে ১২০ কোটি।

৪০। কোনো জীবের DNA কে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে জেল-এ যে সুনির্দিষ্ট ব্যান্ড প্যাটার্ন সৃষ্টি হয় তাকে DNA ফিংগারপ্রিন্ট বলা হয়। হাতের আঙ্গুলের ছাপের মতোই DNA ফিংগারপ্রিন্ট কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয়। একে DNA প্রোফাইলও বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। DNA-কে খণ্ডিত করে—

(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম

(গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

২। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপ হলো—

(i) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন

(ii) নির্দিষ্ট স্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন

(iii) ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

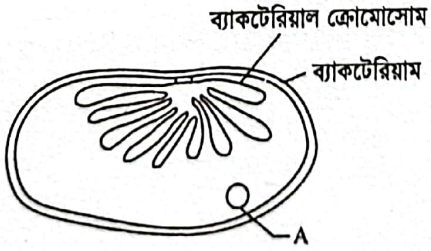

৩। চিত্রের A চিহ্নিত বস্তুটি—

(i) দ্বিসূত্রক (ii) স্বপ্রজননক্ষম (iii) জৈব ছুরি (নাইফ) হিসেবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

CamScanner

৩৬। কোনো জীবকোষে অবস্থিত **জিন সমষ্টিকে** ঐ জীবকোষ তথা ঐ জীবের **জিনোম** বলা হয়।

৩৭। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের **মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট** বলা হয়।

৩৮। কোনো DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলোর অনুক্রমিক সাজানো পদ্ধতি হলো ঐ DNA অণুর **জিনোম সিকোয়েন্স**। কোনো DNA অণুর জিনোম সিকোয়েন্স উদঘাটন পদ্ধতি হলো **জিনোম সিকোয়েন্সিং**।

৩৯। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল হক (এখন প্রয়াত) ও তাঁর সহযোগীরা **তোষা পাটের** (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন, যাতে বেসপেয়ার আছে ১২০ কোটি।

৪০। কোনো জীবের DNA কে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে জেল-এ যে সুনির্দিষ্ট **ব্যান্ড প্যাটার্ন** সৃষ্টি হয় তাকে **DNA ফিংগারপ্রিন্ট** বলা হয়। হাতের আঙ্গুলের ছাপের মতোই DNA ফিংগারপ্রিন্ট কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয়। একে DNA প্রোফাইলও বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। DNA-কে খণ্ডিত করে—

(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম

(গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

২। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপ হলো—

(i) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন

(ii) নির্দিষ্ট স্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন

(iii) ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

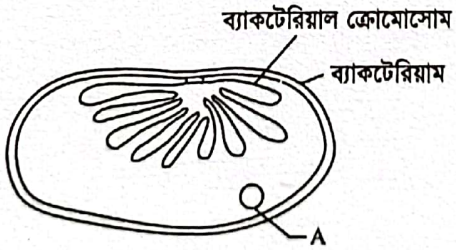

৩। চিত্রের A চিহ্নিত বস্তুটি—

(i) দ্বিসূত্রক (ii) স্বপ্রজননক্ষম (iii) জৈব ছুরি (নাইফ) হিসেবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

CamScanner

i. **সবুজ জীবপ্রযুক্তি বা গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnology) :** কৃষিক্ষেত্রে সুফলদায়ী জীবপ্রযুক্তি। যেমন–Bt বেগুন ও Bt তুলা ইত্যাদি।

ii. **লাল জীবপ্রযুক্তি বা রেড বায়োটেকনোলজি (Red Biotechnology) :** চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– জিন থেরাপি কিংবা DNA ভ্যাকসিন।

iii. **নীল জীবপ্রযুক্তি বা ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) :** জলজ ও সামুদ্রিক জীবের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– ট্রান্সজেনিক মাছ উৎপাদনের সাহায্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

iv. **ধূসর বা শ্বেত জীবপ্রযুক্তি (Grey or White Biotechnology) :** শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত জীবপ্রযুক্তি। যেমন– কারখানায় মদ উৎপাদন, ভিনেগার তৈরি বা চিজ উৎপাদন প্রভৃতি।

জীবপ্রযুক্তির অবদান বা গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি মানবজীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। মানব সভ্যতার বিকাশে এবং বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিয়ত অবদান রেখে যাচ্ছে জীবপ্রযুক্তি। এর উল্লেখযোগ্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষসহ) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) DNA প্রোবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জিনগত রোগ শনাক্তকরণ ও নিরাময় করা। (iii) বিভিন্ন টিউমার কোষকে ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ। (iv) বিভিন্ন জীবাণুকে **জীবাণু অস্ত্র** হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার জিনপ্রযুক্তির অন্যতম অবদান।

২. **প্রোটিন বা এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নত এনজাইম এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত কৃত্রিম পেপটাইড, সঞ্চিত প্রোটিন, নির্দিষ্ট ওষুধ প্রভৃতি জৈব যৌগের উৎপাদন।

৩. **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় খাদ্যাভাব পূরণ করে জীবপ্রযুক্তিজাত খাদ্য। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাই প্রতিরোধী উদ্ভিদ এবং উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা (iv) সালোকসংশ্লেষণে বেশ সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণকারী উদ্ভিদ উৎপাদন (v) যৌন জননে অক্ষম উদ্ভিদ-প্রজাতির মধ্যে দৈহিক সংকরায়নের প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যধারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা। (vi) কৃত্রি প্রজনন পদ্ধতিতে উন্নত জাতের প্রাণী উৎপাদন। (vii) জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে অধিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী, রো প্রতিরোধী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উৎপাদন সমৃদ্ধ ট্রান্সজেনিক প্রাণী, যেমন– মাছ, মুরগি, গরু, মহিষ, শূকর, ভে খরগোশ ইত্যাদি সৃষ্টি করা। (viii) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদ

৪. **চিকিৎসা শাস্ত্রে :** (i) অণুজীবের মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন, মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (ii) বি জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন। (iii) রক্ত, বীর্যরস, অশ্রু, ল ইত্যাদি থেকে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয় ও খুনিসহ অন্যান্য অপরাধী নির্ণয়। একে DNA Finger Printing নামে অভি করা হয়। (iv) মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে বায়োফার্মের মাধ্য হরমোন অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরি করা হচ্ছে। (vi) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে টেস্টটিউব বেবি

৫. **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বি ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন। গাঁজন প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস উৎপাদন। (v) অণুজীব থেকে এনজাইম উৎপাদন।

৬. **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজী ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) অণুজীব বায়ুদূষণ রোধে জৈব ছাঁকনি (biofilters), উপাত্ত সংগ্রহকারী জৈব সংবেদক (biosensors) এবং কম্পিউটারের জন্য চিপস (biochips) উৎপাদন করা হয়। (iv) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

CamScanner

(Ginghua-1, অ্যাম্ব্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড গম) হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব এবং তা থেকে সহজেই ইপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের ৫০টির অধিক প্রজাতির হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ উদ্ভিদে সহজে প্রচ্ছন্নধর্মী মিউটেশন প্রকাশ পায়।

৩. **রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। আলু, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৪. **চারা উৎপাদন :** যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারা গাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

৫. **বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব। যেমন–সাইলোটাম।

৬. **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন :** টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** সৃষ্টি করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য নতুন জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। যে কোনো আবাদী কোষ বা টিস্যু থেকে সৃষ্ট প্রকরণকে **সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** বলা হয়। Adh I নামক গম হলো সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের উদাহরণ। এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। আবাদী গ্যামেট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে **গ্যামেটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন** বলা হয়।

৭. **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটিমাত্র উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ থেকে অল্প সময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ (প্রায় ১০ লক্ষ) চারা উৎপাদন সম্ভব।

৮. **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন :** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ কোষ বা ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** সৃষ্টি করা যায়। পতঙ্গরোধী, আগাছানাশকরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলি উদ্ভিদ যেমন– আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, স্বর্ণধান ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক অভিনব বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

৯. **ভ্রূণ উদ্ধার :** দুটি ভিন্ন প্রজাতির সংকরায়নে সৃষ্ট F_1 অপত্য প্রায়শই বন্ধ্যা হয়। এমন বন্ধ্যা উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হলে তা মারা যায় বা তা থেকে কোনো বীজ উৎপন্ন হয় না। এমন সংকর উদ্ভিদ থেকে ভ্রূণ উদ্ধার করে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করে (culture medium) স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

উদাহরণ : **পাট** – *Corchorus olitorius* × *C.capsularis*
ধান– *Oryza sativa* × *O.officinalis*
টমেটো- *Lycopersicon peruvianum* × *L.lycopersicum*
শিম- *Phaeseolus vulgaris* × *P.angustissimus*

সম্পর্কবিহীন উদ্ভিদেও ভ্রূণপালনের মধ্যে সংকর উদ্ভিদ তৈরি সম্ভব হয়েছে, যথা– *Tritucum aestivum* × *Hordeum vulgare*

১০. **দ্রুত ক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তার :** একই দাতা উদ্ভিদের কোষ নিয়ে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অসংখ্য উদ্ভি ক্লোন তৈরি করা যায়। এভাবে সুন্দর ফুলদায়ী অনেক অর্কিড প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

CamScanner

থাকে। অতিরিক্ত এই বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় **প্লাজমিড** (plasmid)। প্লাজমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সন্নিবেশন এবং সন্নিবেশিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাজমিড (Plasmid) : ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে তাকে **প্লাজমিড** বলে। **Laderberg** (1952) *E.coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষে সর্বপ্রথম প্লাজমিডের সন্ধান পান। প্লাজমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে **অনুলিপন** (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোজোমের বাইরে একটি অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA(ক্রোমাজোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষপ্রতি ১-১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাজমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. প্লাজমিড **বৃত্তাকার** (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
২. এর আণবিক ভর প্রায় 10^6 - 200 x 10^6 dalton.
৩. প্লাজমিড অল্পসংখ্যক জিন ধারণ করে, ক্ষুদ্র ও স্বতন্ত্র।
৪. রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
৫. এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে।
৬. কোনো কোনো প্লাজমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন– colicin, vibriocin ইত্যাদি।
৭. কিছু প্লাজমিড **সেক্স পিলি** তৈরি করে যা কনজুগেশন টিউব তৈরি করে এবং কনজুগেশন ঘটায়।
৮. অন্য প্লাজমিড বা মূল DNA বা অন্য জীবের যে কোনো DNA-এর সাথে পুনঃসমন্বয় করতে সক্ষম।
৯. এদেরকে সহজে পোষক দেহ থেকে পৃথক করা যায়।
১০. প্লাজমিডগুলো **স্ব-বিভাজনক্ষম**।

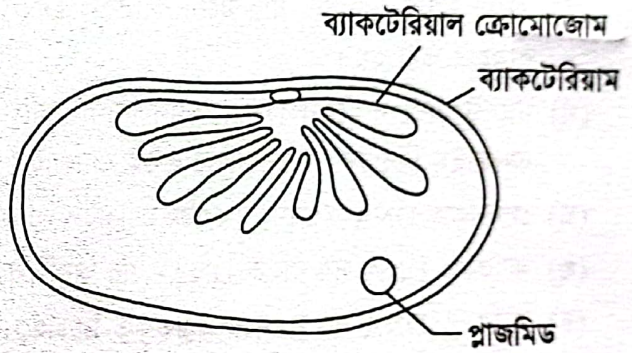

চিত্র ১১.৫ : *Agrobacterium tumefaciens*-এর প্লাজমিড DNA

প্লাজমিডের প্রকারভেদ : ব্যাকটেরিয়ায় প্রাপ্ত প্লাজমিড প্রধানত তিন প্রকার। যথা–

১. **F ও F´- Plasmid বা উর্বর প্লাজমিড :** এরা এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে **জেনেটিক বস্তু** স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। এখানে F(Fertility) ও F´ প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার দেহে **সেক্স পিলি** তৈরি করে, যা যৌন জননে তথা কনজুগেশনে সাহায্য করে।

যেমন : *E coli* তে F ও F´- plasmid পাওয়া যায়।

২. **R-Plasmid বা রোধক প্লাজমিড :** এখানে R-হলো Resistance, এতে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) প্রতিরোধী জিন থাকে। যেমন– Enterobacteriaceae এর R-Plasmid.

৩. **Col-Plasmid :** এতে **কোলিসিন** (colicin) উৎপন্নকারী জিন থাকে। কোলিসিন সংবেদনশীল *E.coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। যেমন– *E-coli* এর Plasmid.

এ ছাড়াও Degradative Plasmid ও Virulance Plasmid পাওয়া যায়।

ডিগ্রেডেটিভ Plasmid : এ ধরনের প্লাজমিডের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ায় টলুইন, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদি অস্বাভাবিক উৎপাদনের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– *Pseudomonas putida* এর *Tol-Plamid*.

ভিরুলেন্স-Plasmid : এগুলোকে রোগ সৃষ্টিকারী Plasmid বলে। *Agrobacterium turnefaciens* এর ti-plasmid এর উপস্থিতির ফলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে Crowngall রোগের সৃষ্টি হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য পোষকগুলো হলো–

- **প্রোক্যারিওটস :** *E.coli* (সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়), *Bacillus subtilis, Agrobacterium tumefaciens* ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া।
- **ছত্রাক :** *Saccharomyces cerevisiae* (ঈস্ট)।
- **ইউক্যারিওটস :** যেকোনো উদ্ভিদ কিংবা প্রাণিকোষ।

প্লাজমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণায় প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে এটি উপযোগী **ভেক্টর** (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাজমিড DNA ব্যবহার করে মানুষের ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাজমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) টার্গেট এবং বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় **রেস্ট্রিকশন এনজাইম** নির্বাচন। উভয়ক্ষেত্রে একই এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) **DNA লাইগেজ** এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA- এর অনুলিপনের জন্য একটি **পোষক** (host) নির্বাচন (যেমন–*E.coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*- এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ
(Steps of Genetic Engineering or Recombinant DNA Technology)

কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বহনকারী DNA অণুর খণ্ডাংশকে আলাদা করে অন্য একটি জীবের DNA অণু (পোষক DNA অণু) সঙ্গে যুক্ত করে যে নতুন ধরনের DNA অণু তৈরি করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রযুক্তিকেই **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি** বলা হয় এবং এ প্রযুক্তিই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূলনীতি। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সম্পন্নের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক ধাপগুলো অবলম্বিত হয়।

১. দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত DNA অণুখন্ড (জিন) আহরণ : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাতা জীব থেকে যখন কাঙ্ক্ষিত DNA আহরিত হয় তখন তাকে **প্যাসেঞ্জার DNA** (passenger DNA) বলে।

প্রত্যক্ষ উপায়ে DNA আহরণকালে প্রথমে দাতা জীবের কোষাবরণী ভেঙ্গে **কোষীয় পদার্থ** মুক্ত করা হয়। মুক্ত উপাদান থেকে সম্পূর্ণ DNA কে আলাদা করে **রেস্ট্রিকশন এনজাইম** (যেমন–Eco RI)-এর সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত DNA

খ. কোষবহির্ভূত জিন ক্লোনিং (In vitro gene cloning) বা PCR (Polymerase Chain Reaction): এটি জিন ক্লোনিং বা DNA ক্লোনিং এর একটি সহজ যান্ত্রিক উপায়। PCR দ্বারা দেহের বাইরে বিক্রিয়া মিশ্রণে কাঙ্ক্ষিত জিনের অনেক প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **Kary Mullis** কোষ বহির্ভূত DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন** (PCR) বলে। PCR এর মাধ্যমে টেস্টটিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায়। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA -কে Tag পলিমারেজ সহযোগে ৯০° সে. তাপমাত্রায় তাপ দিলে DNA এর সূত্রদুটি খুলে ২টি পৃথক একক সূত্রে পরিণত হয়। এরপর ৫০°– ৫৫° সে. নামিয়ে আনলে DNA রেপ্লিকেশনের জন্য – ৫′ প্রান্তে একটি **প্রাইমার** যুক্ত হয়। একটি প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ৭০° – ৭২° সে, তাপমাত্রায় **Tag পলিমারেজ** তখন দ্রুততম গতিতে সম্পূরক সূত্র তৈরী করে। এ প্রক্রিয়া খুব দ্রুততম এবং সহজ প্রক্রিয়া। প্রতি মিনিটে সূত্র তৈরীর হার ১০০০। কম্পিউটার চালিত যে যন্ত্রের মধ্যে DNA সংশ্লেষণ পরিচালিত হয় তাকে **থার্মাল সাইক্লার** (thermal cycler) বলে। এ চেইনের প্রতিটি ধাপে বিক্রিয়া ঘটতে সময় লাগে ২–৫ মিনিট। তিন ঘন্টার কম সময়ে ২৫–৩০টি বিক্রিয়া করে চক্র সম্পন্ন হয়। বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এ হার ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

[**PCR এর ব্যবহার :** রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু বা প্যাথোজেন নিরূপণ; নির্দিষ্ট মিউটেশন নিরূপণ; DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং; জন্মের পূর্বে ভ্রূণে বংশগত রোগ নিরূপণ; বিভিন্ন গবেষণা; আণবিক আর্কিওলজি বা প্যালিওন্টোলজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে।]

২. রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং (Reproductive cloning) : জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বলে। ১৯৯৬ সালে জন্ম নেয়া 'ডলি' নামক ভেড়া (ভেড়ি) রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং-এর মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দাতা ভেড়ার স্তনগ্রন্থির একটি কোষের নিউক্লিয়াসকে গ্রহীতা ভেড়ার ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে স্থাপন করা হয়। এ ডিম্বাণুটি বিভাজিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হয়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে পরিস্ফুটনের মাধ্যমে দাতা ভেড়ার চেহারা সম্পন্ন বাচ্চার জন্ম দেয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডলি'। এ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় ভেড়াটি **সারোগেট মাদার** (surrogate mother) বা **পালক মাতার** ভূমিকা পালন করে।

rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি ও PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি	PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন)
১. ক্লোনিং	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের ক্লোনিং এবং প্রকাশ ঘটানো হয়।	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের শুধুমাত্র ক্লোনিং ঘটানো হয়।
২. সংঘটিত পদ্ধতি	এটি *In-vivo* পদ্ধতি (সজীব কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত)।	এটি *In-vitro* পদ্ধতি (সজীব কোষের বাইরে সংঘটিত)।
৩. ভেক্টরের ভূমিকা	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক।	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক নয়।
৪. উৎসেচক বা এনজাইম	rDNA টেকনোলজির প্রধান উৎসেচক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং DNA এনজাইম।	PCR এর প্রধান উৎসচেক তাপ সহিষ্ণু DNA পলিমারেজ।
৫. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্র	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে rDNA টেকনোলজির ভূমিকা সবচেয়ে অধিক।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে PCR এর ভূমিকা সবচেয়ে কম।

CamScanner

১৯. ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী সৃষ্টি : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজিন সন্নিবেশিত করণের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীকে **ট্রান্সজেনিক প্রাণী** (transgenic animal) বা **GM প্রাণী** বলে। প্রাণীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিন ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে প্রধানত গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত পদার্থের বা বস্তুর পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন করা হয়, যেমন– (i) গৃহপালিত পশুপাখিতে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে অনুপ্রবেশ করানো; (ii) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করা; (iii) অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস, মাছ এবং উন্নত মানের পশম উৎপাদন; (iv) ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা; (v) জিনের বহিঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা ইত্যাদি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সফলভাবে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা হয়।

ট্রান্সজেনিক প্রাণীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম সফলতা হলো মানুষের **antithrombin III** উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক ছাগলের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যান্টিথ্রম্বিন ডিফিসিয়েন্সী** (antithrombin deficiency) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দ্বিতীয় সফলতা হলো মানুষের **C12 esterase inhibitor** উৎপাদন যা ট্রান্সজেনিক খরগোশের দুধ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মানুষের বংশগত রোগ **অ্যানজিওডেমা** (angiodema) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

২০. অন্যান্য : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুতে ২০-৪০% স্টার্চ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং টমেটোতে স্টার্চের পরিমাণ কমিয়ে সুক্রোজের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক উদ্ভিদকে উষ্ণতা, শৈত্য, ভারী ধাতু, নাইট্রোজেন, লবণাক্ততা প্রভৃতি মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
১. প্রবেশের প্রক্রিয়া	ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা জাইগোটে বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানো হয়।	ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়।
২. জিনগত পার্থক্য	বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	দুটি প্রাণীর নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
৩. বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।
৪. জিনোমগত পার্থক্য	জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	জিনোমগত গঠন হুবহু এক।
৫. মিউটেশন বা প্রকরণ	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
৬. বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা দেয়।	বাহ্যিক প্রকাশ হুবহু রকম।
৭. ব্যবহার	শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	কেবল ডিম্বাণুর খোলশ ব্যবহৃত হয়।

GMO কী ?

যে প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির DNA থেকে জিন সংগ্রহ করে সম্পর্কহীন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিনে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ ঘটিয়ে জিনগত পরিবর্তিত জীবের সৃষ্টি করা হয় তাকে GMO বলে।

GMO সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

২. গ্রোথ হরমোন উৎপাদন : মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী গ্রোথ হরমোন **সোমাটোট্রপিন** উৎপাদনকারী জিনকে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে (*E.coli*) সংযুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে এ হরমোন উৎপাদন করা হচ্ছে। এ হরমোন বামনত্ব রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। প্রতি সপ্তাহে ৬–১০ মিলিগ্রাম গ্রোথ হরমোন প্রয়োগে প্রথম বছরেই মানুষ ৬ সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা হয়।

৩. বায়োফার্মিং (Biopharming) : যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড় মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে **বায়োফার্মিং** বলে। i. জীবন রক্ষাকারী antithrombin এখন অতি অল্প খরচে ছাগলের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। ii. GMO ছাগলের দুধ থেকে শক্তিশালী spider silk উৎপাদন করা হচ্ছে। iii. ইনসুলিন এখন কুসুম ফুলের বীজের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য হয়েছে।

৪. জিন থেরাপি (Gene therapy) : কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো **জিন থেরাপি**। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে, যথা : i. গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা ii. একটি বাহক (vector), সাধারণ একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

ভাইরাস কোনো কোষে প্রবেশ করে তার নিজস্ব DNA কে আক্রান্ত কোষের ক্রোমোজোমে সংযুক্ত করতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে– i. ভাইরাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কোষে ড্রাগ প্রবেশ করানো যায়। ii. কাঙ্ক্ষিত জিন প্রবেশ করানো হয় এবং iii. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৫. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন : সাধারণত অণুজীব থেকে (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অ্যান্টিবায়োটক উৎপাদন করা হয়। জীবপ্রযুক্তিতে প্রায় এক হাজারের মতো অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন– Penicillin, Cephalosporin, Bactrocin, Amoxicillin, Streptomycin, Tetracyclin ইত্যাদি।

৬. গর্ভের শিশু পরীক্ষা : মাতৃগর্ভে শিশুর কোনো অস্বাভাবিকতা **অ্যামনিওসিস** (amniosis) জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিরূপণ করা যায়।

৭. মলিকুলার ফার্মিং : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক প্রাণিদের রক্ত, মল, মূত্র ও দুধ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা যায়। ওষুধ আহরণের এ প্রক্রিয়াকে **মলিকুলার ফার্মিং** (molecular farming) বলে। ট্রান্সজেনিক ছাগলের দুধ থেকে TPA (tissue plasminogen activetor) পাওয়া যায়।

৮. বংশগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : বংশগত Autosomal dominent বর্তমানে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।

৯. গ্লাইকোপ্রোটিন AAT উৎপাদন : গ্লাইকোপ্রোটিন AAT (a-1-antitrypsin) মানুষের যকৃতে উৎপন্ন হয়। ট্রান্সজেনিক ভেড়ার দুধ থেকে AAT সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষের ফুসফুসের **এমফাইসেমা** (emphysema) রোগের চিকিৎসায় AAT ব্যবহার করা হয়।

১০. জেনেটিক ডিসঅর্ডার দূরীকরণ : মানবদেহের প্রায় ৩,৫০০টি জেনেটিক ডিসঅর্ডার রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করার চেষ্টা চলছে।

১১. মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি : কোনো বিজাতীয় পদার্থ (সাধারণত প্রোটিন জাতীয়) মানুষের দেহে প্রবেশ করলে যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় তাকে **অ্যান্টিবডি** (antibody) বলে এবং বিজাতীয় পদার্থকে **অ্যান্টিজেন** (antigen) বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রভাবে যে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাকে **মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি** (monoclonal antibody) বলে। এটি জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করে মাতৃত্ব নির্ণয়ে, রোগ নির্ণয়ে, রোগ নিরাময়ে ও প্রতিস্থাপিত অঙ্গের প্রত্যাখ্যান রোধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

CamScanner

১০. ইনসুলিন ... বিশুদ্ধ ইনসুলিন উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে প্রবেশ করানো হয়। [দেহে ইনসুলিন র সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ ঘর ভিতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।]

ইন্টারফেরন (Interferon)

ইন্টারফেরন এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন (প্রায় ২০-৩০ হাজার ডাল্টন) সম্পন্ন প্রোটিন (গ্লাইকোপ্রোটিন), যা ম্ফোসাইট, শ্বেত রক্তকণিকা এবং ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি প্রধানত ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ , তবে ক্যান্সার কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতেও বাধা দেয়। ইন্টারফেরন (interferon) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে interference ং ব্যাঘাত থেকে। **দেহের ভিতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি ভাইরাসজনিত আক্রমণ প্রতিরোধী প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে রফেরন বলে।** একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু (যেমন–শ্বেত রক্তকণিকা, ফাইব্রোব্লাস্ট ইত্যাদি) থেকে বিভিন্ন ধরনের রফেরন তৈরী হতে দেখা যায়। এটি প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের র্গত অর্থাৎ ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন। ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alick Isaac's** এবং **Jean ndermann** সর্বপ্রথম ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন। ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট হরমোন, যা মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের টি গ্রুপ। ভৌত রাসায়নিক ও অ্যান্টিজেনিক গুণের ভিত্তিতে ইন্টারফেরন তিন ধরনের. যথা–Interferon-α, erferon-β এবং Interferon-γ। প্রতিটি ঈস্ট কোষে ১ মিলিয়ন (১০ লাখ) অণু ইন্টারফেরন তৈরি হয় এবং অপরদিকে oli এর ভিতর 10×10^5 অণু তৈরী হয়।

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ

নিম্নলিখিত জীবপ্রযুক্তির ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মানব ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয়–

১. শুরুতে মানুষের **ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ** থেকে DNA সংগ্রহ করে তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে পৃথক করা হয়।
২. প্লাজমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।
৩. এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে **লাইগেজ** এনজাইম দিয়ে প্লাজমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটি **রিকম্বিনেন্ট DNA অণু** তৈরি করা হয়।
৪. প্লাজমিড মুক্ত *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে ইন্টারফেরন জিনযুক্ত রিকম্বিনেরন্ট DNA কে প্রবেশ করানো হয়, ফলে তৈরি হয় **ট্রান্সজেনিক** *E.coli*।
৫. ট্রান্সজেনিক *E.coli* কে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে তাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়।
৬. *E.coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টাফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।
৭. আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।
৮. বিশেষ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে উৎপাদিত ও বাজারজাত বহুল প্রচলিত একটি ইন্টারফেরন হলো Betaferon.

ইন্টারফেরনের গুরুত্ব ও ব্যবহার

i. ইন্টারফেরন দেহাভ্যন্তরে ভাইরাসের বিভাজনকে (সংখ্যাবৃদ্ধি) রোধ করে। ii. ইমিউন সিস্টেমকে (অনাক্রম্যতন্ত্র) রণ করে। iii. পোষকের অনাক্রম্য কোষকে উত্তেজিত করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। iv. B ও T-লিম্ফোসাইটের খ্যাবৃদ্ধি দমন করে। v. NR-কোষ (Natural Killer Cells) এর ক্ষমতা ও সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের খ্যাবৃদ্ধিকে বাধা দেয়। vi. ভাইরাসজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। vii. অ্যান্টিবডি উৎপাদন প্রতিরোধ করে। viii. বর্তমানে oli ও ঈস্ট থেকে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন হচ্ছে, যা হেপাটাইটিস-বি,

CamScanner

হার্পিস সংক্রমণ, প্যাপিলোমিয়া, জলাতঙ্ক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নাসিকাপথে, পেশিতে বা রক্তস্রোতে প্রবেশ করা হয়।

TPA বা tPA (Tissue Plasminogen Activator)

TPA (টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাকটিভেটর) প্রোটিনধর্মী পদার্থ। এরা রক্তের নিষ্ক্রিয় প্লাজমিনোজেনকে সক্রিয় প্লাজমিনে পরিণত করতে পারে। মানুষের রক্তে **প্লাজমিন** নামক এনজাইমটি নিষ্ক্রিয় ও কর্মহীন অবস্থায় **প্লাজমিনোজেন** হিসেবে বিরাজ করে। রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে প্লাজমিনোজেন সক্রিয় হয়ে প্লাজমিনে পরিণত হয়, যা জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে দিতে পারে। জমাট বাঁধা রক্তকে গলানোর এ প্রক্রিয়াকে **ফাইব্রিনোলাইসিস** (fibrinolysis) বলে। মানুষের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে স্ট্রোক অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে TPA ব্যবহার করে ফাইব্রিনোলাইসিস ঘটানো হয়। ১৯৭০ সালের দিকে জমাট বাঁধা রক্তকে গলাতে ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত **স্ট্রেপটোকাইনেজ** (streptokinase) নামক এনজাইম ব্যবহৃত হতো, কিন্তু এটি বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। TPA ব্যবহার করলে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

i. মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা।
ii. mRNA থেকে cDNA তৈরি করা।
iii. cDNA-কে উপযুক্ত প্লাজমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা।
iv. রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E.coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো।
v. আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E.coli* কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা।
vi. *E.coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা।
vii. হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ব্লক বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।
viii. TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO)

কিডনিতে (বৃক্ক) উৎপন্ন যে হরমোন অস্থিমজ্জা (bone marrow)-এর কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাকে **ইরিথ্রোপোইটিন** (EPO) বলে। RBC তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ইরিথ্রোপোইসিস** (erythropoiesis)। কাজেই সহজভাবে বলা যায়, **কিডনিতে উৎপন্ন যে হরমোন ইরিথ্রোপোইসিস ঘটায় তাকেই ইরথ্রোপোইটিন বলে**। উল্লেখ্য যে, ভ্রূণীয় অবস্থায় যকৃতে (liver) ইরিথ্রোপোইটিন সৃষ্টি হয়। কিডনি ডায়ালাইসিস করলে রক্ত থেকে EPO বের হয়ে যায়, এর ফলে রোগীর দেহে RBC কমে যায় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে EPO তৈরি করা যায়।

EPO তৈরির প্রক্রিয়া

১. মানুষের দেহ থেকে EPO সৃষ্টির জন্য দায়ী জিন (কাঙ্ক্ষিত জিন) পৃথক করা হয়।
২. উপযুক্ত প্লাজমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে তাতে DNA ligase এর সহায়তায় ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন সংযুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়।
৩. অতঃপর রিকম্বিনেন্ট DNA-কে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় পোষক *E.coli* -এর কোষে প্রবেশ করানো হয়।
৪. এরপর কালচার মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA-সহ *E.coli*-আবাদ করে সংখ্যাবৃদ্ধি (ক্লোনিং) করা হয়।
৫. এসব ব্যাকটেরীয় **ক্লোন** (*E.coli*) থেকে EPO সংগ্রহ করে ওষুধ হিসেবে বাজারজাত করা হয়। এরূপ EPO-এর বাণিজ্যিক নাম **Epogen**।

ইরিথ্রোপোইটিনের ব্যবহার : কিডনীরোগীকে EPO ইনজেকশন দিয়ে রক্তশূন্যতা দূর করা সম্ভব হয়।

CamScanner

...(Environmental Management)

যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী উপাদানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় বা উপাদানগুলোকে পুনঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় বা উপস্থিত পরিবেশকে উন্নত করা যায়, তাকেই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। মানুষ আজ যতই সভ্যতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ততই মনুষ্য সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সেই সংকট হচ্ছে পরিবেশ দূষণ সমস্যা। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরী স্থাপন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন প্রভৃতি পরিবেশ সংকটের প্রধান কারণ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে সাগরে তেল নির্গমন এবং মানুষের পরিত্যক্ত জৈব ও অজৈব পদার্থসামগ্রীর সুব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। যার ফলে পরিবেশের বায়ু, পানি ও ভূমি কোনোটাই আজ দূষণমুক্ত নয়।

সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ক. কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য : কলকারখানা ও খনি থেকে বাষ্পাকারে নির্গত SO_2, CO_2, CO, NO, NH_4, Cl_2 প্রভৃতি গ্যাস বাতাসকে দূষিত করে এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং জিঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্যপদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। জার্মানিতে অ্যালুমিনিয়াম কারখানার বর্জ্যপদার্থ থেকে ফেরিফ্লুক তৈরী করা হয়। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা **single cell protein** হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (diary) কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে **ল্যাকটিক এসিড** তৈরি করা হয়। কাগজ শিল্পের

চিত্র ১১.১২ : শিল্প নির্গত বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনার ফ্লোচার্ট

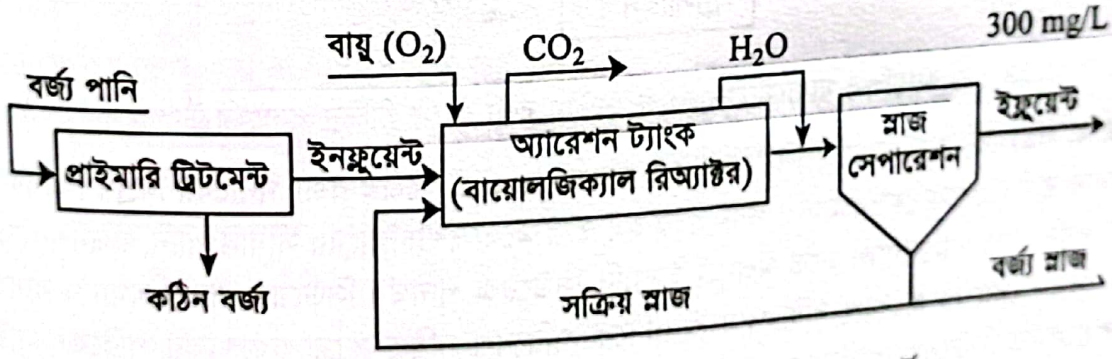

কাঁচামাল ব্লিচ করতে **ক্লোরিন** ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন–বিভিন্ন জৈব এসিড (অ্যাসিটিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, টারটারিক এসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো এসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, বুটানল ইত্যাদি।

খ. সমুদ্রে তেল নির্গমন : বড় বড় বন্দরে তেলবাহী জাহাজ থেকে নিঃসৃত পেট্রোল, ডিজেল বা অপরিশোধিত তেল পানিকে দূষিত করে। এ দূষণ নদী বা সমুদ্রে বসবাসরত অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাগরে চালিত তেলবাহী সুপার ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনায় কবলিত হলে, ট্যাঙ্কারের তেল সাগরে পুরু আস্তরণের সৃষ্টি করে। ঐ তেলের সংস্পর্শে এলে অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এ ধরনের দূষণ রোধে বর্তমানে ক্ষুদ্র অণুজীব ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা পানিকে নাইট্রেটস ও ফসফেটস মুক্ত করে পরিষ্কার পানিতে রূপান্তর করা হয়। এ ধরনের সিউয়েজ আত্তীকরণের প্রথম পর্যায়টি যান্ত্রিক, দ্বিতীয়টি জৈবপ্রযুক্তি এবং তৃতীয়টি রাসায়নিক পরিশোধন। জৈবপ্রযুক্তি দ্বারা জৈব যৌগের পচনে *Nitrosomonas, Nitrobacter, Clostridium,* Protozoa প্রভৃতি অণুজীবকে ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেন বিমুক্তকারী ব্যাকটেরিয়া যেমন– *Bacillus denitrificans.*

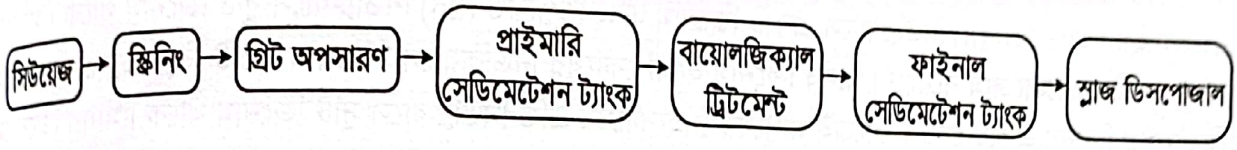

চিত্র ১১.১৩ : সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া

Pseudomonas, Micrococcus প্রভৃতি সিউয়েজ উপাদানগুলোর নাইট্রেট যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে নাইট্রোজেনে পরিণত করে। সবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (*Azotobacoter*), অবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (*Clostridium*), সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া (*Chlorobium, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas*) প্রভৃতি সিউয়েজের উপাদানগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে তরল পদার্থে পরিণত করে। এসব তরল পদার্থে বিভিন্ন ধরনের শৈবালের আবাদ করা হয়। ড্রেনের ময়লা পচন প্রক্রিয়ায় *Enterobactor, E,coli, Pseudomonas, Zooglea ramigera* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ময়লা ও আবর্জনার পচন ঘটিয়ে তরল পদার্থে পরিণত করে। এগুলো যথাযথ পরিশোধনের পরে মূল্যবান জৈব সারে পরিণত করা হয়।

জীব প্রযুক্তির সম্ভাবনা (Prospects of Biotechnology)

সারা বিশ্বের অনেক সমস্যা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের যত্ন, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ। নিচে জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো।

১. **জিন থেরাপি ও আরএনএআই (Gene therapy & RNAi) :** বংশগতীয় রোগ, ক্যান্সার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে corrected জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi ও জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।

২. **মাইক্রো আরএনএ (Micro RNA) :** ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ, এসব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক বিশেষ প্রয়োগ। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।

৩. **স্টেম সেল :** জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্টেম সেল কোষ সৃষ্টি করে হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন, যেকোনো অঙ্গের কোষ তৈরি, নতুন ওষুধের পরীক্ষা ইত্যাদি পূর্বের চেয়ে সহজতর হয়েছে।

৪. **জিনোম স্ক্যানিং :** জিনোম স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত যে কোনো জীবের জিনোম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হবে।

৫. **ন্যানোটেকনোলজি :** চাহিদা অনুসারে জৈববস্তুর উৎপাদন করার জন্য ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হবে।

৬. **GM অণুজীব** ব্যবহার করে পরিবেশের দূষণমাত্রা রোধ করা সম্ভব হবে।

৭. জীবপ্রযুক্তি কৃষকের বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করছে। নিকট ভবিষ্যতে কম দূষকযুক্ত কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং

বাংলাদেশি বিজ্ঞানী **ড. মাকসুদুল আলম** ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি। এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার ফলে উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, স্বল্প জীবনকাল পাট, ক্ষরা সহিষ্ণু পাট, ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের ভাবনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক **হলুদ মোজাইক ভাইরাস** এর জিনোম সিকোয়েন্সি করেছেন। ফলে মুগডাল এ ভাইরাস প্রতিরোধী হবে এবং পাতা কোকড়ানো রোগ থেকে টমেটো রক্ষা পাবে। করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং এ অবদান রেখেছে কিছু প্রতিষ্ঠান। তৎমধ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা (BCSIR) প্রতিষ্ঠান প্রধান।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোজোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	বেসপেয়ার (basepair)
E.coli (১৯৯৭ সালে এর জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়)	1	3200	4.6 মিলিয়ন
Haemophilus influenzae (ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রথম)	1	1700	1.8 মিলিয়ন
Saccharomyces cerevisiae (ঈস্ট, সুকেন্দ্রিক জীবের মধ্যে সর্বপ্রথম)	16	6000	12.1 মিলিয়ন
Caenorhabditis elegans (নিমাটোড, বহুকোষী প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথম)	6	20000	100 মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সর্বপ্রথম)	10	25000	100 মিলিয়ন
Homo sapiens (মানুষ, ২০০৩ সালে চূড়ান্ত প্রজেক্ট প্রকাশিত হয়; এখনো কাজ চলছে)	46	25000 (+বহু অপ্রকাশিত)	3.2 বিলিয়ন

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger prints)

DNA finger prints বলতে মানুষের হাতের আঙ্গুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। DNA অনেকগুলো নিউক্লিওটাইডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA এর নিউক্লিওটাইড এর সজ্জারীতির মাধ্যমে মানুষের শনাক্তকরণ পদ্ধতিকে DNA finger prints বা DNA profile বলে। অন্যভাবে A pattern of bands on a gel that is unique to each individual is DNA finger print.

- **আবিষ্কারক :** বিজ্ঞানী **Alec Jeffreys** এবং তাঁর সহযোগীরা (Jeffreys *et al.*) ১৯৮৫ সালে DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আদালতে এ পদ্ধতিটি গৃহীত হয় ১৯৮৬ সালে।
- **DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা (Materials for DNA finger printing) :** মানুষের ক্ষেত্রে রক্তের দাগ (WBC), বীর্য, অস্থিমজ্জা, চুলের গোড়া, ত্বক ইত্যাদিতে অবস্থিত কোষ।

না হয় তার ওপর সম্যক দৃষ্টি আরোপই জীবনিরাপত্তা বা জীবজ সুরক্ষা বা বায়োসেফটি (Biosafety is the avoidance of risk to human health and safety and to the conservation of the environment, as a result of the use for research and commerce of infectious of genetically modified organisms)। **মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠীকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তাকে জীবনিরাপত্তা (biosafety)** বলা হয়।

মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহারে মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এই Bt. বেগুন মানুষের ইমিউন সিস্টেমের কোনো ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের উপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এ নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করা আছে। এ নির্দেশিকার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।

এই Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি **জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি** (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে **প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি** (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও **জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি** (Biosafety Core Committee), **মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি** (Field Level Biosafety Committee) এবং **জীব নিরাপত্তা অফিসার** (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

- জীবনিরাপত্তা সমুন্নত রেখে জীবপ্রযুক্তি গবেষণাকে সহজতর করা।
- জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক জীবাণুর অবমুক্ত হওয়া রোধ করা।
- জীবপ্রযুক্তিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও স্থানান্তরকরণ মনিটরিং করা।
- GMO/LMO-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা। (CBP-এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে।)
- GMO/LMO ক্ষতিকারক নয় বলে প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

জীবের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ঝুঁকি (Health Safety Risk of Living Organisms)

মানুষের সার্বিক মঙ্গলার্থে জীবপ্রযুক্তি সৃষ্টি হলেও কোনো কোনো দিক দিয়ে জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে জীবের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান। নিচে জীবের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ঝুঁকি বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

১. জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও এর অনিয়মিত ব্যবহারে মানুষের দেহ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

২. স্কটল্যান্ডের রওয়েট গবেষণাকেন্দ্র (Rowett Research Institute, Scotland) এক ধরনের GM আলুগাছ (Genetically Modified Potato) উদ্ভাবন করেছে। এসব গাছের আলুর মধ্যে এক ধরনের লেকটিন পাওয়া যায়, যা ইঁদুরের অনাক্রম্যতা নষ্ট করে ও তাদের বৃদ্ধি রোধ করে। অর্থাৎ GM আলু খাওয়ানো ইঁদুরের যকৃত আকারে ছোট ও অপুষ্ট ধরনের হয়।

CamScanner

৩. পরীক্ষাগারে যে সব মা ইঁদুরকে GM Food খাওয়ানো হয় তাদের অর্ধেক বাচ্চা ৩ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। GM খাদ্য খাওয়ানো ইঁদুরের শুক্রাশয়ে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

৪. ট্রান্সজেনিক জীবে অপ্রত্যাশিত প্রোটিন সৃষ্টি হয়ে তা **অ্যালার্জেন** (allergen) হিসেবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে শিশুদের মারাত্মক অ্যালার্জির জন্য ট্রান্সজেনিক বাদাম ও কিছু GM Food কে দায়ী করা হয়।

৫. Bt Bringal (Bt বেগুন) মানুষের ইমিউন সিস্টেমের সামান্যতম ক্ষতি করে, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৬. সাধারণ জীবপ্রযুক্তিতে উৎপাদিত Bt তুলা গাছ **পেস্ট বল ওয়ার্ম** (BAll Worm) প্রতিরোধ হয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বল ওয়ার্মও Bt টক্সিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী তৈরি করে তুলাগাছের ক্ষতি সাধন করে। ভারতে Bt তুলা উদ্ভিদের পাতা খেয়ে কয়েক হাজার ভেড়া, মহিষ ও ছাগলের মৃত্যু হয়েছিল।

৭. কিছু GM Food মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, বিশেষ করে শিশুদের **ইস্ট্রোজেন লেভেল** (estrogen level) বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৮. GM Food এর ব্যবহারে জীবদেহে বিষক্রিয়া ও পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে এবং এদের ব্যাপক ব্যবহারে খাদ্য বৈচিত্র্য হ্রাস পায় এবং খাদ্য শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়।

৯. কোনো কোনো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য **জীবন্মৃত ভাইরাস** (attenuateal virus) ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো কারণে যদি এই জীবন্মৃত ভাইরাসের মিউটেশন ঘটে ভাইরাস **ভিরুলেন্ট** (virulent) হয়ে ওঠে তবে তা মানুষের অনেক ক্ষতি করে।

ঝুঁকি নির্ধারণ

Cartagena Protocol এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষাধীন GMO/LMO এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক হলে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা বিবেচনা করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

গবেষণাগারে GMO/LMO নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য বিধানসমূহ

১. গবেষণার মূলনীতি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে পারে।
২. দক্ষ গবেষক নিশ্চিত করতে হবে।
৩. গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির তথ্য রাখতে হবে।
৪. নিরাপত্তা বিধান অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলো অনুসন্ধান করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে GMOs/LMOs ব্যবহার বা অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ

১. মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. যে পরিবেশে এদের প্রয়োগ করা হবে তার উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।
৩. GMOs/LMOs এর জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।
৪. কোনো GMOs/LMOs এর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা যাবে না।

CamScanner

চারা উৎপাদন করা হয় এবং জেনেটিক গবেষণার জন্য হোমোজাইগাস ব্রিডিং লাইন সৃষ্টি করা হয়। চারা থেকে পদ্ধতিতে গুয়ান -18 জাতের ধান ও জিনঘুয়া-1 জাতের গম উৎপাদন করা হয়েছে।

৭। এমব্রায়ো কালচার (Embryo culture): পরিপক্ক কিংবা অপরিপক্ক বন্ধ্যা প্রকৃতির উদ্ভিদ ভ্রূণ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে এমব্রায়ো কালচার বলে। বীজের সুপ্তাবস্থা দমন করা কিংবা প্রজননক্ষম উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য এমব্রায়ো কালচার করা হয়। এ পদ্ধতিতে পেঁপে, বেল ও বেগুনের চারা উৎপাদন করা হয়েছে।

৮। সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন (Somaclonal variation): টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত উদ্ভিদের মধ্যে যে প্রকরণ (পার্থক্য) পরিলক্ষিত হয় তাকে সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। কোষ কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত উদ্ভিদের মধ্যে বিরাজিত প্রকরণকেও সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। এ প্রযুক্তির প্রধান পাঁচটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো: (১) অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (২) রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (৩) অজীব পীড়ন সহনশীল উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; (৪) আগাছা নাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন; এবং (৫) উদ্ভিদ বীজের গুণগত মান উন্নয়ন।

৯। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি: (Production of transgenic plants): জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে যে জিনকে কোনো একটি জীবের দেহে স্থানান্তর করা হয় তাকে ট্রান্সজিন (transgene) বলে। যে জীবে ট্রান্সজিন স্থানান্তর ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে ট্রান্সজেনিক জীব (transgenic organism) বলে। উদ্ভিদ কোষে ট্রান্সজিন স্থানান্তর করে সেখান থেকে টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে চারা উৎপাদন করা হয়। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক কলা, টমেটো, ধান, গাজর ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে হেপাটাইটিস বি, কলেরা, HIV ইত্যাদি রোগের টিকা উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১০। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ (Germplasm Conservation): বিপন্ন, বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদদের এক্স-সিটু পদ্ধতিতে জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। গ্রিন হাইজ, নার্সারি কিংবা মাঠে সংরক্ষণের চেয়ে ইন ভিট্রো জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ অনেক সাশ্রয়ী। এছাড়া ক্রায়োপ্রিজারভেশন করা কোষ ও কলা থেকে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন করা সংরক্ষণ জীবপ্রযুক্তির একটি ফলপ্রসু দিক। ক্রায়োপ্রিজারভেশন হলো তরল নাইট্রোজেনে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের কোষ, কলা কিংবা অন্য কোনো সজীব অংশ সংরক্ষণ করা।

১১.২ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবের জিনোমে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির এক বা একাধিক কাঙ্খিত জিন প্রবেশ করানো এবং কাঙ্খিত জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলে। অন্য কথায় নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA তে অন্য কোনো উৎসের DNA সংস্থাপনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। যে পদ্ধতিতে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর কার্য সমাধা করা হয় তাকে জিন ক্লোনিং (Gene cloning) বা রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (recombinant DNA technology) বলা হয়। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে DNA-র কাঙ্খিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সৃষ্ট জীবকে GMO (Genetically modified organism), GEO (Genetically engineered organism) বা TO (Transgenic organism) বলে। জেমস ওয়াটসন (James Watson) ও ফ্রান্সিস ক্রিক (Francis Crick) কর্তৃক 1953 সালে DNA আবিষ্কারের দুই বছর পূর্বে অর্থাৎ 1951 সালে সায়েন্স ফিকশন লেখক জ্যাক উইলিয়ামসন (Jack Williamson) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Dragon's Island*-এ সর্বপ্রথম "genetic engineering" শব্দটি ব্যবহার করেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাইলফলক (Milestones of genetic engineering)

- 1972 সালে পল বার্গ (Paul Berg) সর্বপ্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করেন। এক্ষেত্রে ল্যাম্ডা ভাইরাসের DNA-র সাথে বানরের দেহে বিদ্যমান SV40 ভাইরাসের DNA-র সংযোগ ঘটানো হয়। এজন্য তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জনক বলা হয়।

CamScanner

- 1972 সালে হার্বার্ট বয়্যার (Herbert Boyer) ও স্ট্যানলি কোহেন (Stanley Cohen) *Escherichia coli* (*E. coli*) ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক জীব সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন।
- 1974 সালে রোডল্ফ জ্যানিচ (Rudolf Jaenisch) ইঁদুরের ভ্রূণে বাইরের DNA প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক ইঁদুর সৃষ্টি করেন যা বিশ্বের প্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণী হিসেবে বিবেচিত।
- 1982 সাল থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া বাজারজাত করা শুরু হয়।
- 1994 সাল থেকে GMO খাদ্য বিক্রি শুরু হয়।
- 2003 সালে প্রথম GMO নকশাকৃত প্রাণী Glofish আমেরিকাতে বিক্রি হয়।
- 2010 সালে J. Craig Venter Institute -এর বিজ্ঞানীরা সিনথিয়া (Synthia) নামক ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেন যা বিশ্বের প্রথম সিনথেটিক জীব হিসেবে গণ্য।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহৃত উপাদান

১। **কাঙ্ক্ষিত জিন** (Desired gene): উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বা উৎপাদ সৃষ্টির লক্ষে কোনো জীবের যে জিনকে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় তাকে কাঙ্খিত জিন বলে।

২। **পরিপূরক DNA** (Complementary DNA): জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য mRNA থেকে সৃষ্ট DNA কে পরিপূরক DNA বা cDNA বলে। রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইম দ্বারা ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতিতে এ DNA তৈরি করা হয়। কিছু ভাইরাস (HIV) প্রাকৃতিকভাবে এ ধরনের DNA উৎপাদন করে।

৩। **এনজাইম** (Enzymes): রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন এনজাইম ও তাদের কার্যাবলি নিম্নে দেয়া হলো:

এনজাইমের নাম	কার্যাবলি
রেস্ট্রিকশন এনজাইম	এ এনজাইম দ্বারা DNA-এর কাঙ্খিত অংশ কর্তন করা হয়। এটি DNA অণুর নির্দিষ্ট ক্ষারক অণুক্রমে কাজ করে।
রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম	mRNA-এর পরিপূরক cDNA অণুক্রম সৃষ্টি করে।
DNA পলিমারেজ এনজাইম	অনুরূপ DNA তৈরি করে (যেমন DNA থেকে cDNA)।
নিউক্লিয়েজ এনজাইম	DNA-র অসমান প্রান্তকে কেটে সমান করে।
টার্মিনাল ট্রান্সফারেজ এনজাইম	DNA-র স্টিকি প্রান্ত তৈরি করে।
DNA লাইগেজ এনজাইম	এটি DNA-র কর্তিত অংশকে প্লাজমিড এর কর্তিত অংশের সাথে জোড়া লাগিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করে।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme)

যেসব এনজাইম দ্বিতন্ত্রী DNA-এর নির্দিষ্ট অনুক্রম বা সিকুয়েন্স শনাক্ত করে দ্বি-সূত্রক বন্ধনী কর্তন করতে পারে তাদের রেস্ট্রিকশন এনজাইম বা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ বা সংক্ষেপে RE বলে। যেমন, DNA অণুর যেসব স্থানে ক্ষারকের বিন্যাস GAATTC / CTTAAG প্রকৃতির সেখানে কেবল চার ক্ষারক যুক্ত স্থানগুলো *Eco RI* রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কর্তিত হয়। এ এনজাইমটি অন্য কোনোভাবে সাজানো ক্ষারক সমষ্টিকে স্পর্শ করতে পারে না। বিজ্ঞানী হেমিলটন স্মিথ (Hamilton Smith, 1970) এবং সহযোগিরা রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কার করেন। ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রাকৃতিকভাবে রেস্ট্রিকশন এনজাইম তৈরি হয়। কিন্তু DNA অণুর সুনির্দিষ্ট স্থান কাটার জন্য এটি জিন প্রকৌশলে ব্যাপক (কয়েক হাজার রকমের) ব্যবহৃত হয়। এজন্য এদেরকে আণবিক কাঁচি (molecular

১১.৪ জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Use of biotechnology)

কৃষি উৎপাদনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের খাদ্য চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে দেশ ও সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা। দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জীবপ্রযুক্তিবিদগণ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ করে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানো কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ দ্বারা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম, খরা ও লবণ সহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত করা হয়েছে। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর অণুজীব এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে জেনেটিক বস্তুর প্রধান ঘটিয়ে জেনেটিক পুনর্বিন্যাস সৃষ্টির সুযোগ হয়েছে। রিকম্বিনেন্ট **DNA** প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট জীবকে ট্রান্সজেনিক **(transgenic organism)** বা জিনতাত্ত্বিক রূপান্তরিত জীব **(genetically modified organism-G** বলে। GMO থেকে উৎপাদিত শস্যকে জি এম শস্য (GM crop) এবং খাদ্যকে জেনেটিক খাদ্য (genetic f বলে। পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবেশ বান্ধব বালাই নাশক, আগাছা নাশক ইত্যাদি তৈরির জন্য GMO সৃষ্টি করা হ এসব উন্নত জীব দারিদ্র পীড়িত জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা পূরণ করে এবং পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক ব্যবহারের পরিবেশ দূষণ রোধ হয়।

বিশ্বজুড়ে জীবপ্রযুক্তিবিদগণ বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন GM উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি করেছেন এবং এগুলো বাণিজ্যিক ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে এধরনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

১। অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি: কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলী উদ্ভিদে প্রতিস্থাপিত করে কি জিনের গঠন বা বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এভাবে ধান, গম, তৈলবীজ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২। গোল্ডেন রাইস সৃষ্টি: সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইনগো পোট্রাইকাস (Ingo Potrykus) জার্মানির ফ্রিইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার বায়ার (Peter Beyer) যৌথভাবে 2000 সালে গোল্ডেন রাইস নামক এ ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে Japonica টাইপ ধানে ড্যাফোডিল উদ্ভি বিটা ক্যারোটিন সংশ্লেষক জিন *psy* (phytoene synthase) ও মাটির ব্যাকটেরিয়া *Erwinia uredovora*-এ *crtI* (carotene desaturase) জিন প্রতিস্থাপন করে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করেন। এ ধানের চাল দেখতে গোল্ডেন সোনালি বর্ণের এবং এ চালের ভাত খেলে শিশুরা ভিটামিন ও আয়রনের অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয় না। এ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি শিশু অন্ধত্ব ও আয়রনের অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাবে 2005 সালে গোল্ডেন রাইস-২ নামের আরো একটি ধানের জাত সৃষ্টি করা হয় যাতে পূর্ববর্তী গোল্ডেন রাইস থেকে ২ গুণ বেশি বিটা ক্যারোটিন থাকে।

৩। ফ্লেভার সেভার টমেটো সৃষ্টি: জংলি (wild) জাতের টমেটো *Lycopersicon escolentum* থেকে PG (polygalacturonase reverse) জিন সংগ্রহ করে আধুনিক জাতের টমেটোতে (*Lycopersicon lycopersicum*) প্রবেশ করিয়ে আমেরিকার ক্যালজেন কোম্পানি ফ্লেভার সেভার জাতের টমেটো (CGN-89564-2) সৃষ্টি করেছে। এর স্বাদ ও গন্ধ উন্নত। PG জিন থাকার কারণে এ টমেটো দেরিতে পাকে, সহজে পচে না এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ টমেটোর চাষ অনুমোদিত হয়েছে।

৪। পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি আলু, তুলা, গম, আপেল ইত্যাদি উদ্ভিদে পতঙ্গরোধী (i) *Bacillus thuriengiensis* ব্যাকটেরিয়ার *Bt toxin* gene, (ii) Cowpea এর *CpTi* gene স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এসব উদ্ভিদের পাতা পোকায় ভক্ষণ করলে 48 ঘণ্টার মধ্যে এদের মৃত্যু হয়।

বিটি বেগুন (*Bt* brinjal): বিটি বেগুন হলো জিনগতভাবে পরিবর্তিত বেগুনের একটি জাত। মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া *Bacillus thuriengiensis* এর ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন বেগুনের বিভিন্ন জাতের জিনের সাথে মিশিয়ে এ *Bt* বেগুনের জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জেনেটিক পরিবর্তনের সময় আরো কিছু অ্যান্টিবডি প্রতিরোধকারী জিন ও

CamScanner

৪. **চিকিৎসা ও ওষুধ:** i. রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের উপকরণ উৎপাদন। ii. মানুষের বংশগতি ত্রুটিজনিত রোগ জিন থেরাপি দ্বারা নির্মূল করা। iii. বায়োফার্মিং এর মাধ্যমে অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে জিন স্থানান্তর করে মানুষের প্রয়োজনীয় শর্করা, প্রোটিন, অ্যালকালয়েড, হরমোন, এনজাইম, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি উৎপাদন। iv. ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। v. বিভিন্ন প্রকার বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। vi. বিভিন্ন রোগের টিকা উৎপাদন। vii. বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৫. **পশু পালন:** i. বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী দীর্ঘজীবী গবাদিপশু উৎপাদন। ii. অধিক বর্ধন, অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত তৈরি।

৬. **শিল্পক্ষেত্রে:** i. রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি দ্বারা ওষুধ শিল্পে ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, সোমাটোস্ট্যাটিনসহ অসংখ্য চিকিৎসা উপকরণ উৎপাদন করা। ii. বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্য রাসায়নিক পদার্থ (যেমন- এনজাইম, জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল ইত্যাদি) উৎপাদন। iii. এনজাইম থেকে কোমল পানীয়ের জন্য মিষ্টি দ্রব্য উৎপাদন। vi. *Bacillus amyloliquefaciens* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদন। v. *E. coli* ও অন্যান্য অণুজীবের মাধ্যমে গ্লুকোজ ও জাইলুলোজ থেকে অধিক পরিমাণ ইথানল তৈরি।

৭. **পরিবেশ:** i. মানুষ, গবাদিপশু, শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস করা ও পরিবেশ নির্মল করা। ii. গৃহস্থালি ও গবাদি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরি। iii. বায়ু দূষণ রোধে বায়োফিল্টার (biofilters), বায়োসেন্সর (biosensors) ও কম্পিউটারের জন্য বায়োচিপস্ (biochips) তৈরি হচ্ছে। iv. জিন ব্যাংক তৈরি করে জীববৈচিত্র্য ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সুরক্ষা করা। v. সুপার বাগ ব্যাকটেরিয়া সমুদ্রে নির্গত তেল শোধনে ব্যবহার হয়। vi. অপচনযোগ্য রাসায়নিক, প্লাস্টিক পচন উপযোগী করতে ট্রান্সজেনিক অণুজীব ব্যবহার হচ্ছে।

৮. **ভারী ধাতু নিষ্কাশন:** i. আকরিক থেকে কপার, ইউরেনিয়াম, সিসা, সোনা প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনে বিভিন্ন জাতের জিএমএম (Genetically Modified Microorganisms) ব্যবহার হচ্ছে। ii. *Thiobacillus ferroxidans* এর রূপান্তরিত জাত ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহার হয়।

৯. **বিবিধ ক্ষেত্র:** i. মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে ভাইরাস শনাক্তকরণ। ii. বিভিন্ন জীবাণুকে "জীবাণু অস্ত্রে" ব্যবহার করে সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। iii. DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট বা জিনোম সিকুয়েন্স ব্যবহার করে পিতৃত্ব, ধর্ষক, খুনি বা মৃতদেহ শনাক্তকরণ। iv. উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তি ও জাতিজনি নির্ধারণ।

১. দলীয় কাজ

তোমরা ৫ জনের একটি দলে ভাগ হয়ে জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি পোস্টার পেপার তৈরি করো।

২. বাড়ির কাজ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব শীর্ষক একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

CamScanner

৭. প্লাসমিড অল্প সংখ্যক জিন ধারণ করে।

৮. কোনো কোনো প্লাসমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে। যেমন- Colicin, Vibriocin ইত্যাদি।

প্লাসমিডের প্রকারভেদ : প্লাসমিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা–

i. **F এবং F′ প্লাসমিড:** এসব প্লাসমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। F(fertility) ও F′-প্লাসমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে Pili তৈরি করে, যা যৌনজননে সাহায্য করে।

ii. **R-প্লাসমিড:** এসব প্লাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে। R_6-প্লাসমিড ৬টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

iii. **কোল প্লাসমিড:** যেসব প্লাসমিডে কোলিসিন (colicin) উৎপাদনকারী জিন থাকে তাদেরকে কোল প্লাসমিড বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাসমিডের সমতুল্য আরেক ধরনের প্লাসমিড আছে যাতে **ভিব্রিওসিন** (vibriocin) উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল *Vibrio cholerae* কোষকে ধ্বংস করে।

প্লাসমিডের ব্যবহার: আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাসমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে প্লাসমিড অত্যন্ত উপযোগী বাহক (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাসমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন, মানুষের ইনসুলিন জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রেসট্রিকশন এনজাইম (Restriction Enzyme): যে এনজাইম দিয়ে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট জিন বা DNA অণু কাটা যায় তাকে রেসট্রিকশন এনজাইম বলে। এগুলো restriction endonuclease বা restrictase নামেও পরিচিত। প্রতিটা ব্যাকটেরিয়া কোষে এক বা একাধিক ধরনের রেসট্রিকশন এনজাইম থাকে, যা সংক্রামক ভাইরাল DNA কেটে থাকে।

এখানে Hind III রেসট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কাটা স্থান দেখানো হয়েছে।

এগুলো প্রত্যেকে নিউক্লিওটাইডের ভিন্ন ভিন্ন সিকোয়েন্স দক্ষতার সাথে কেটে থাকে। এজন্য এদের 'বায়োলজিক্যাল নাইফ' বা **"আণবিক কাঁচি"** (molecular scissor) বলা হয়। সাধারণত ৪-৬ জোড়া ক্ষারক অংশ কেটে থাকে। যেমন- Eco RI, Hind III, Bam HI, Mbo I প্রভৃতি।

এ ধরনের এনজাইমগুলো ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিব্যাকটেরিয়ার কোষে পাওয়া যায়, যা দ্বারা আক্রমণকারী ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অর্থাৎ ভাইরাসের DNA সূত্রটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিনষ্ট হয়। যে পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশকৃত DNA অণু রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কাটা হয় তাকে **রেসট্রিকশন পরিপাক** (restriction digestion) বলে। পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়া তার নিজের DNA **মিথাইলেশন** (methylation) পদ্ধতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে তার নিজস্ব প্রস্তুতকৃত রেসট্রিকশন এনজাইমের হাত থেকে রক্ষা করে। এভাবে দু'টি প্রক্রিয়াকে একত্রে **restriction modification system** বলে।

এ পর্যন্ত ৩,০০০ এর বেশি রেসট্রিকশন এনজাইম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬০০ এর অধিক বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত রেসট্রিকশন এনজাইমগুলো চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত (যেমন Type I, II, III ও IV)। এক্ষেত্রে রেসট্রিকশন এনজাইমের রাসায়নিক গঠন, কো-ফ্যাক্টর, কর্তন স্থান এবং নির্দিষ্টতার বিবেচনা করা হয়। এছাড়া কৃত্রিম রেসট্রিকশন এনজাইমও আবিষ্কার হয়েছে।

বাড়ির কাজ

১১.৭ জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে হরমোন ও প্রোটিন উৎপাদন
(Hormones and Proteins Production through Biotechnology)

১১.৭.১ ইনসুলিন (Insulin)

১৯১৬ সালে Sir Edward Sharpy-Schafer সর্বপ্রথম ইনসুলিন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। ইনসুলিন হলো একটি **গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয়ের বিটা (β) কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়।** ইনসুলিন রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। কোনো কারণে অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে বা কম নিঃসৃত হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় বা ডায়াবেটিস রোগ হয়। এমতাবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়াবেটিস রোগীকে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন গ্রহণ করতে হয়।

১৯৪৫ সালে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Federick Sanger ও সহগবেষকরা সর্বপ্রথম ইনসুলিনের আণবিক গঠন আবিষ্কার করেন। **ইনসুলিন হচ্ছে অন্যতম ক্ষুদ্র প্রোটিন।** এটি A ও B নামক দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত। জিন প্রকৌশল তথা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়। এ কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily and Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় **'হিউমুলিন'** নামে।

ইনসুলিন উৎপাদন: নিম্নলিখিত ধারাবাহিক ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়ে থাকে–

১. **ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ:** জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদনের প্রথম ধাপ হলো ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্ত করা। এক্ষেত্রে মানুষের DNA-তে ইনসুলিন জিনের অবস্থান শনাক্ত করা হয়।

২. **DNA থেকে ইনসুলিন জিন পৃথকীকরণ:** রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ কেটে পৃথক করা হয়।

৩. **বাহক প্লাসমিড পৃথকীকরণ:** ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়া থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্লাসমিড DNA-কে পৃথক করা হয়।

৪. **প্লাসমিড DNA-র একাংশ কর্তন:** ইনসুলিন জিন স্থাপনের জন্য প্লাসমিডের এক অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে ফাঁকা করা হয়।

৫. **প্লাসমিডে ইনসুলিন জিন স্থাপন:** এ ধাপে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটি *E. coli* প্লাসমিডের কর্তিত অংশে বসিয়ে লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এভাবে তৈরি হয় রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড।

৬. **রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড একটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো:** ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় সাধারণত এটি করা হয়। হিট শক মেথড অথবা ইলেকট্রিক পাল্‌স মেথডে করা হয়। এক্ষেত্রে বাহককে (*E. coli*) অবশ্যই নিজস্ব প্লাসমিড মুক্ত হতে হয়। প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য বাহককে Competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে বাহককে (*E. coli*) প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪-১৬ ঘণ্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E. coli* এর কোষপ্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E. coli* কোষকে প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য Competent করে থাকে। এরপর *E. coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে একত্রে মিশ্রিত করে একটি পাত্রে আধা ঘণ্টা বরফে, পরে ৪২° সে তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E. coli* কোষ রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে শোষণ করে দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। ফলে *E. coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ GMO *E. coli* -এ বা ট্রান্সজেনিক *E. coli* -এ পরিণত হয়।

CamScanner

১১.৭.২ ইন্টারফেরন (Interferon)

দেহের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধী প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে বলা হয় ইন্টারফেরন ইন্টারফেরন হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনের একটি গ্রুপ। ১৯৫৭ সালে Alec Issacs এবং Jean Lindenmann সর্বপ্রথম ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন। এটি মূলত এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন। কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসরণ করে। নিঃসৃত ইন্টারফেরন আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে ভাইরাসটি আর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না এবং পরবর্তী কোষগুলোকে আর আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই সংক্রমিত কোষের চারপাশের কোষগুলো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং ধীরে ধীরে তারা ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে।

ইন্টারফেরনের গুরুত্ব: ইন্টারফেরনের গুরুত্বগুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

(i) ইন্টারফেরন মূলত দেহাভ্যন্তরে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। (ii) ভাইরাসঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি নাসিকাপথে, পেশিতে বা রক্তস্রোতেও প্রয়োগ করা যায়। (iii) পোষকের অনাক্রম্য কোষকে উত্তেজিত করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। (iv) অ্যান্টিবডি উৎপাদন প্রতিরোধ করে। (v) B ও T লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধিকে দমন করে। (vi) NK কোষের (Natural Killar Cells) ক্ষমতা ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (vii) ইম্যুনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

ইন্টারফেরন উৎপাদন: নিম্নলিখিত জীবপ্রযুক্তির ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মানব ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয়–

১. শুরুতে মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে DNA সংগ্রহ করে তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে পৃথক করা হয়।
২. বাহক হিসেবে নির্বাচিত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কাটা হয়।
৩. পরবর্তীতে লাইগেজ এনজাইম দিয়ে ইন্টারফেরন জিন অংশকে প্লাসমিডের কাটা অংশে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে তৈরি হয় রিকম্বিনেন্ট DNA অণু।
৪. প্লাসমিড মুক্ত *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে ইন্টারফেরন জিনযুক্ত রিকম্বিনেন্ট DNA কে প্রবেশ করানো হয়, ফলে তৈরি হয় ট্রান্সজেনিক *E. coli*।
৫. ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে তাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়। *E. coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টারফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।
৬. আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।
৭. বিশেষ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে উৎপাদিত ও বাজারজাত বহুল প্রচলিত একটি ইন্টারফেরন হলো 'Betaferon'।

১১.৭.৩ ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO)

ইরিথ্রোপোইটিন (EPO) হলো মানুষের কিডনিতে উৎপন্ন হওয়া এক ধরনের হরমোন। এটি রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে **অস্থিমজ্জাতে** (bone marrow) প্রবেশ করে এবং সেখানে কোষ বিভাজনকে উদ্দীপ্ত করে প্রচুর লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরিতে ভূমিকা রাখে। কিডনি বিকল হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস এক ধরনের নিয়মিত চিকিৎসা। এ সময় রোগীর দেহ থেকে এই হরমোনটি (EPO) রক্ত থেকে বের হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে RBC অতিমাত্রায় কমে যায়। এতে রোগী রক্তশূন্যতায় ভোগে।

EPO উৎপাদন: জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে EPO তৈরির প্রক্রিয়া নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. শুরুতে মানব DNA থেকে EPO তৈরির জিন শনাক্ত করে তা রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে পৃথক করতে হবে।
২. বাহক হিসেবে নির্বাচিত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটতে হবে।
৩. পরবর্তীতে লাইগেজ এনজাইম দিয়ে EPO তৈরির জিন অংশকে প্লাসমিডের কাটা অংশে যুক্ত করতে হবে। ফলে তৈরি হবে রিকম্বিনেন্ট DNA অণু।

CamScanner

rDNA টেকনোলজি	PCR
i. rDNA টেকনোলজির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডের ক্লোনিং এবং প্রকাশ ঘটানো হয়।	i. PCR-এর ক্ষেত্রে জিন বা নির্দিষ্ট DNA খণ্ডের ক্লোনিং ঘটানো হয়।
ii. এক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় না।	ii. PCR-এর ক্ষেত্রে বাহক অত্যাবশ্যক।
iii. এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং DNA লাইগেজ rDNA টেকনোলজির প্রধান উৎসেচক।	iii. PCR-এর প্রধান উৎসেচক হলো তাপ সহিষ্ণু DNA পলিমারেজ।
iv. rDNA টেকনোলজির ভূমিকা জিন-প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক।	iv. PCR-এর ভূমিকা জিন-প্রকৌশলের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম।
v. এটি সজীব কোষের ভেতরে সংঘটিত পদ্ধতি।	v. এটি সজীব কোষের বাইরে সংঘটিত পদ্ধতি।

▶ টিস্যু কালচার ও সংকরায়ন এর মধ্যে পার্থক্য

টিস্যু কালচার	সংকরায়ন
i. একটি প্যারেন্টের যেকোনো একটি বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে নতুন বংশধর সৃষ্টি করা হয়।	i. দুটি প্যারেন্টের মধ্যে কৃত্রিমভাবে যৌন মিলন ঘটিয়ে নতুন বংশধর সৃষ্টি করা হয়।
ii. অল্প সময়ে বেশি সংখ্যক বংশধর সৃষ্টি হয়।	ii. তুলনামূলক বেশি সময়ে কম সংখ্যক বংশধর সৃষ্টি হয়।
iii. কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে কম সময় লাগে।	iii. কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে দীর্ঘ সময় লাগে।
iv. বীজ উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদেও এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করানো যায়।	iv. বীজ উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অকার্যকর।
v. এটি এক প্রকার নিয়ন্ত্রিত অজাজ জনন পদ্ধতি।	v. এটি এক প্রকার নিয়ন্ত্রিত যৌন জনন পদ্ধতি।
vi. প্যারেন্ট ও অপত্য উদ্ভিদ সমগুণ সম্পন্ন হয়।	vi. প্যারেন্ট ও অপত্য উদ্ভিদ ভিন্নগুণ সম্পন্ন হয়।
vii. অপত্য উদ্ভিদ সাধারণত অনুন্নত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়।	vii. অপত্য উদ্ভিদ সাধারণত উন্নত ও সবল প্রকৃতির হয়।
viii. অপত্য জীবে সাধারণত নতুন গুণের বিকাশ ঘটে না।	viii. অপত্য জীবে নতুন গুণের বিকাশ ঘটে।
ix. সাধারণত জিন বিনিময় ঘটে না।	ix. জিন বিনিময় অবশ্যম্ভাবী।

▶ ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
i. ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা জাইগোটে বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানো হয়।	i. ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়।
ii. ট্রান্সজেনিক প্রাণীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে অধিকাংশ সময় ভিন্নতা প্রকাশ পায়।	ii. বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হুবহু একই রকম।
iii. এ ধরনের প্রাণীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	iii. ক্লোন প্রাণীতে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।
iv. জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	iv. জিনোমগত গঠন হুবহু এক।
v. মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	v. মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
vi. ট্রান্সজেনিক প্রাণীতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	vi. ক্লোন প্রাণীতে কোনো জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
vii. শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	vii. কেবল ডিম্বাণুর খোলস ব্যবহৃত হয়।

CamScanner